ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

রচনা

মুহাম্মদ আবদুল মালেক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ড. মোহাম্মদ ইউছুফ
মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ
ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

সম্পাদনা

ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান
মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৫

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
রেবেকা সুলতানা লিপি
মোঃ আনিছুর রহমান

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
আরিফুর রহমান তপু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ–কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্বঅভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

ইসলামের মূল স্তম্ভ ও বিধানসমূহ শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। একবিংশ শতকের এই সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে ইসলামের শাশ্বত বিধানসমূহকে জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মানবতাবাদী জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সহনশীলতা, উদারতা, শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে – যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও কর্ম-অনুশীলন প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়ের শিরোনাম	অধ্যায়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়ের শিরোনাম	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**আকাইদ**	১		সূরা আন-নাস্‌র	৬৪
	ইমান	২		আয়াতুল কুরসি	৬৫
	নিফাক	৫		সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত	৬৮
	আসমাউল হুসনা	৬		আল-কুরআন ও নৈতিক শিক্ষা	৭০
	রিসালাত	১০		মোনাজাতমূলক তিনটি হাদিস	৭২
	খতমে নবুয়ত	১১		হাদিসের আলোকে নৈতিক শিক্ষা	৭৩
	আখিরাত	১৪	**চতুর্থ অধ্যায়**	**আখলাক**	**৭৯**
	শাফাআত	১৫		আখলাকের প্রকার	৭৯
	জান্নাত	১৭		কতিপয় আখলাকে হামিদাহ	৮১
	জাহান্নাম	১৯		ভ্রাতৃত্ব	৮২
	ইমান ও নৈতিকতা	২১		নারীর মর্যাদা	৮৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	**ইবাদত**	২৫		সমাজসেবা	৮৫
	যাকাত	২৫		দেশপ্রেম	৮৭
	যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত	২৭		পরমতসহিষ্ণুতা	৮৮
	যাকাতের মাসারিফ	২৯		আখলাকে যামিমাহ	৮৯
	যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৩০		অহংকার	৯০
	হজ	৩২		অশ্লীলতা	৯১
	হজের ফরজসমূহ	৩৫		পরশ্রীকাতরতা	৯২
	হজ পালনের নিয়ম	৩৬		ঘৃণা	৯৩
	কুরবানি	৩৯		চৌর্যবৃত্তি	৯৪
	আকিকা	৪১		ঘুষ	৯৬
	কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা	৪২		সন্ত্রাস	৯৭
তৃতীয় অধ্যায়	**কুরআন ও হাদিস শিক্ষা**	৪৬		এইচআইভি এবং এইডস	৯৮
	কুরআন মজিদ	৪৬	**পঞ্চম অধ্যায়**	**আদর্শ জীবনচরিত**	**১০৩**
	তাজবিদ	৪৯		হযরত সুলায়মান (আ.)	১০৪
	নুন সাকিন ও তানবিনের বর্ণনা	৫০		হযরত মুসা (আ.)	১০৭
	মীম সাকিনের বর্ণনা	৫৩		হযরত ঈসা (আ.)	১১০
	নাযিরা তিলাওয়াত	৫৪		হযরত মুহাম্মদ (স.)	১১২
	সূরা আল-কাদর	৫৫		হযরত আয়িশা (রা.)	১১৭
	সূরা আল-যিলযাল	৫৭		হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)	১২০
	সূরা আল-ফিল	৬০		হযরত রাবেয়া বসরি (র.)	১২৩
	সূরা কুরাইশ	৬২			

প্রথম অধ্যায়
আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

পরিচয়

ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম মৌলিক কতিপয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। যেমন- আল্লাহ্ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের এরূপ মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাসকে আকাইদ বলা হয়। আকাইদ শব্দটি বহুবচন। একবচনে 'আকিদা' যার অর্থ বিশ্বাস। আকাইদের বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। এর কোনো একটিকে অবিশ্বাস করলে কেউ মুসলিম হতে পারে না। অতএব, আকাইদ হলো ইসলামের প্রধান ভিত্তি।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ইমানের পরিচয় ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ইমানের প্রধান সাতটি বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি অটল বিশ্বাস (ইমান) স্থাপন ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব।
- নিফাকের (কপটতা) পরিচয় ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব এবং নিফাক পরিহার করার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- কপটতামূলক আচরণ পরিহার করে চলতে আগ্রহী হব।
- আল্লাহ্ তায়ালার কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মহান আল্লাহর গুণবাচক নামে বিধৃত গুণ নিজ আচরণে প্রতিফলন ঘটাবো।
- রিসালাতের অর্থ, নবি-রাসুলের সংখ্যা, নবি-রাসুলের পার্থক্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারব।
- নবুয়ত ও রিসালাতের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খতমে নবুয়তের পরিচয়, তাৎপর্য ও প্রমাণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আখিরাত ও কিয়ামত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শাফাআতের পরিচয় ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জান্নাতের পরিচয় ও তা লাভের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- জাহান্নামের পরিচয় ও স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- নৈতিক চরিত্র গঠনে ইমানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

ইমান (اَلْإِيْمَانُ)

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই ইমান বলা হয়। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদির ইত্যাদি বিষয় মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়াই হলো ইমান। যে ব্যক্তি এসব বিষয়কে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন তিনি হলেন মুমিন।

ইমানের তিনটি দিক রয়েছে। এগুলো হলো-

ক. অন্তরে বিশ্বাস করা,

খ. মুখে স্বীকার করা এবং

গ. তদনুসারে আমল করা।

অর্থাৎ ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করার নাম হলো ইমান। প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য এ তিনটি বিষয় থাকা জরুরি। কেউ যদি শুধু অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে স্বীকার না করে তবে সে প্রকৃতপক্ষে ইমানদার বা মুমিন হিসেবে গণ্য হয় না। আবার মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলেও কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না। বস্তুত আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমলের সমষ্টিই হলো প্রকৃত ইমান।

ইমানের সাতটি বিষয়ের বিবরণ

ইমান বা বিশ্বাসের মৌলিক বিষয় মোট সাতটি। মুমিন হওয়ার জন্য এ সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমরা পূর্বের শ্রেণিতে ইমানে মুফাস্‌সাল সম্পর্কে জেনেছি। তাতে ইমানের সাতটি বিষয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ পাঠে আমরা বিস্তারিতভাবে এ সাতটি বিষয় সম্পর্কে জানব।

১. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের রব, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী, জন্ম ও মৃত্যুর মালিক। তিনি সকল গুণের আধার। তিনি পবিত্র, ক্ষমাশীল, দয়াবান, পরম দয়াময়, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

আল্লাহ তায়ালা অনন্ত অসীম। তিনি সবসময় ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি অতুলনীয়। তিনি ঠিক তেমনই যেমনভাবে তিনি বিরাজমান। তাঁর অসংখ্য সুন্দর নাম রয়েছে। তাঁর পিতা, পুত্র এবং স্ত্রী নেই। তিনিই একমাত্র সত্তা। তাঁর সমকক্ষ, সমতুল্য বা শরিক কেউ নেই। সমস্ত প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও সকল ক্ষমতাসহ বিশ্বাস করাই হলো ইমানের সর্বপ্রধান বিষয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ নুরের তৈরী। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সদাসর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার জিকির ও তাসবিহ্ পাঠে রত। তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত।

ফেরেশতাগণ অদৃশ্য। তবে আল্লাহর আদেশে তাঁরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা পুরুষ নন আবার নারীও নন। তাঁদের আহার-নিদ্রার প্রয়োজন নেই। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত কেউই তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা জানে না। ফেরেশতাগণের মধ্যে ৪ জন হলেন প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন হযরত জিবরাইল (আ.), হযরত মিকাইল (আ.), হযরত আজরাইল (আ.) এবং হযরত ইসরাফিল (আ.)।

৩. আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে নবি-রাসুলগণের নিকট আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলো হলো আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র বাণীসমষ্টি। এসব কিতাবে আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় পরিচয় ও ক্ষমতার বর্ণনা প্রদান করেছেন। মানুষের জীবনযাপনের জন্য নানা আদেশ-নিষেধ প্রদান করেছেন। এ কিতাবগুলো আসমানি কিতাব নামে পরিচিত। আল্লাহ্ তায়ালা নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে এসব কিতাব আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন।

আসমানি কিতাব সর্বমোট একশত চার (১০৪) খানা। তন্মধ্যে ১০০টি ছোট। এগুলোকে বলা হয় সহিফা। আর বাকি ৪ খানা বড়। এগুলো হলো- তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআন। আল কুরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে। এটি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ তথা পরিপূর্ণ জীবন-বিধান।

৪. নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। তাঁরা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা দিতেন। কোন পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে তা দেখিয়ে দিতেন। নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাই সর্বাধিক।

সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালিন বা রাসুলগণের সর্দার। তিনি আমাদের নবি, ইসলামের নবি। আমরা তাঁরই উম্মত।

৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাত হলো পরকাল। দুনিয়ার জীবনের পর মানুষের আরও একটি জীবন রয়েছে। এ জীবন স্থায়ী ও অনন্তকালব্যাপী। এটাই হলো পরকাল। আখিরাত বা পরকালের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। কিয়ামত, কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাত জীবনের একেকটি স্তর। আখিরাত হলো কর্মফল ভোগের স্থান। মানুষ দুনিয়ার জীবনে যেমন কাজ করবে আখিরাতে তেমন ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে আখিরাতে পুরস্কার পাবে। তার স্থান হবে জান্নাতে। আর যে খারাপ কাজ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে।

৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তাকদির অর্থ ভাগ্য। তাকদির আল্লাহ তায়ালা থেকে নির্ধারিত। ভালো-মন্দ যা কিছু হয় সবই আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হয়। সুতরাং দুনিয়াতে ভালো কিছু লাভ করলে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যাবে না। বরং এটি আল্লাহরই দান। তাই আল্লাহ তায়ালার শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে বিপদে-আপদে বা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে হতাশ হওয়া যাবে না। অন্যায় ও দুর্নীতি করা যাবে না। বরং এটিও আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকেই এসেছে। সুতরাং এ অবস্থায় সবর বা ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। অতএব, আমরা তাকদিরে বিশ্বাস করব এবং সাধ্যমতো নেক কাজ করব।

৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

মৃত্যুর পর আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে। দুনিয়ার প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলকেই আল্লাহ তায়ালা জীবিত করবেন। একেই বলা হয় পুনরুত্থান। এ সময় সবাই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। আল্লাহ তায়ালা সেদিন প্রত্যেকের নিকট নিজ নিজ আমলের হিসাব চাইবেন। আমাদের সেদিন তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সেখানে পাপ-পুণ্যের ওজন করবেন, হিসাব নেবেন। তিনিই হবেন একমাত্র বিচারক। অতঃপর ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

উল্লিখিত সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এগুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করলে আমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারব।

ইমান আনার শুভ পরিণাম

ইমান আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। ইমানের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে। মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে শ্রদ্ধা, সম্মান, কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেন। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ: "আর সম্মান তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের জন্যই।" (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ৮)

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয়পাত্র। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ভালোবাসেন। আখিরাতে তিনি মুমিনদের চিরশান্তির জান্নাত দান করবেন। মুমিনগণ সেখানে চিরকাল থাকবেন। জান্নাতের সকল নিয়ামত ভোগ করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাঁদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা আল-কাহাফ, আয়াত ১০৭-১০৮)

আমরা ইমানের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে পড়ব। এ সম্পর্কে জানব এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। অতঃপর এগুলোর অনুসরণ করে নিজ জীবন গড়ে তুলব। আমরা সবসময় নেক কাজ করব। কখনো অন্যায় ও অত্যাচার করব না। এভাবে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও সফলতা লাভ করতে সক্ষম হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা-

ক. ইমানের সাতটি বিষয় লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

খ. ইমানের সাতটি বিষয়ের বিবরণ বাড়ি থেকে খাতায় লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।

গ. দলে বিভক্ত হয়ে ইমান আনার কী কী শুভ পরিণাম রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২
নিফাক (اَلنِّفَاقُ)

পরিচয়

নিফাক শব্দের অর্থ ভণ্ডামি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখী নীতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মুখে ইমানের স্বীকার ও অন্তরে অবিশ্বাস করাকে নিফাক বলা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিকরা সাধারণত সামাজিক ও পার্থিব লাভের জন্য এরূপ করে থাকে। তারা মুসলমান ও কাফির উভয় দলের সাথেই থাকে। প্রকাশ্যে তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে। কিন্তু গোপনে তারা ইসলামকে অস্বীকার করে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝

অর্থ: "যখন তারা (মুনাফিকরা) ইমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা ইমান এনেছি। আর যখন তারা গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৪)

এক কথায় অন্তরে কুফর রেখে মুখে মুখে ইমানের কথা প্রকাশকে নিফাক বলে। আর এরূপ প্রকাশকারী হলো মুনাফিক।

মুনাফিকদের চরিত্র

নিফাক হলো নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শের বিপরীত কাজ। মুনাফিকদের চরিত্র দেখলে আমরা এ সত্য জানতে পাই। তারা সব ধরনের অন্যায় ও মন্দ কাজ করে থাকে। উত্তম আচরণ ও উত্তম চরিত্র তারা কখনোই অনুশীলন করে না। বরং মিথ্যা ও প্রতারণাই তাদের প্রধান কাজ। আল্লাহ পাক বলেন-

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝

অর্থ : "আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।" (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত ১)

রাসুলুল্লাহ (স.) বহু হাদিসে মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

অর্থ : "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা হয় তখন তার খিয়ানত করে।" (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

নিফাকের কুফল ও পরিণতি

নিফাক জঘন্যতম পাপ। এটা মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে ফেলে। নিফাকের ফলে মানুষ অন্যায় ও অশ্লীল কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়। নিফাকের দ্বারা মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে মানব সমাজে মারামারি, হানাহানি ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মুনাফিকরা ইসলামের চরম শত্রু। এরা বাইরে মুসলমান বলে দাবি করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কাফিরদের পক্ষে কাজ করে। এদের গোপন শত্রুতা মুসলমানদের বিপদে ফেলে। এ শত্রুরা গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। ইসলাম ও মুসলমানদের গোপন কথা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। এরা মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ও মারামারি সৃষ্টির চেষ্টা করে। প্রকাশ্য শত্রুর তুলনায় গোপন শত্রু বেশি ক্ষতিকর। কেননা প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। কিন্তু যে গোপনে শত্রুতা করে তাকে চেনা যায় না। তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষা করারও সুযোগ পাওয়া যায় না। ফলে সে বন্ধু বেশে সহজেই বড় ক্ষতিসাধন করতে পারে। এসব কারণে দুনিয়াতে মুনাফিকরা ঘৃণিত ও নিন্দিত হয়। আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠোর আযাব। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)

আমরা সকলেই নিফাক থেকে বেঁচে থাকব। হাদিসে যেসব কাজ মুনাফিকের নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে আমরা সেগুলো বর্জন করব। খাঁটি মুমিন হিসেবে জীবনযাপনের চেষ্টা করব।

নিফাক পরিহারের উপায়

১. কথা বলার সময় সত্য কথা বলবে, মিথ্যা কথা বলবে না।

২. কাউকে কথা দিলে তা রক্ষা করবে।

৩. আমানত রক্ষা করবে। যেমন কারো কাছে কোনো জিনিস ও সম্পদ আমানত রাখলে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে এবং ফেরত দিবে। কারো সাথে কথা দিলে তা রক্ষা করবে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করবে না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা–

ক. দলে বিভক্ত হয়ে মুনাফিকের নিদর্শনগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খ. নিফাকের কুফল ও পরিণতি সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩

আসমাউল হুসনা (اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى)

আসমাউল হুসনা শব্দের অর্থ সুন্দর নামসমূহ। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহকে একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয়। আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালার এরূপ বহু গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিস শরিফে আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি গুণবাচক নামের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম অসংখ্য। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত হলো ৯৯টি নাম। যেমন– আলিম, খাবির, রায্যাক, গাফ্ফার, রাহীম, রাহমান ইত্যাদি।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নামগুলো তাঁর পরিচয় ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়। এ নামগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। ফলে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করতে সহজ হয়।

এ নামগুলোর দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকতে পারি। তিনি এসব নামে ডাকলে খুশি হন। এসব নাম ধরে আমরা মোনাজাত করতে পারি। তিনি স্বয়ং বলেছেন-

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۗ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

অর্থ : "আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সে সকল নাম দ্বারাই ডাকো। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করো। অচিরেই তাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৮০)

আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ আমাদের উত্তম চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ অর্জনের জন্য মানুষ তার জীবনে চর্চা করলে সে সৎচরিত্রবান হয়। সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে-

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫

অর্থ : (আমরা গ্রহণ করলাম) "আল্লাহর রং, আর রঙে আল্লাহ অপেক্ষা আর কে অধিকতর সুন্দর?" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৩৮)

আল্লাহর রং হলো আল্লাহর দীন ও তাঁর গুণাবলি। আর সর্বোত্তম গুণাবলিতো আল্লাহরই। সুতরাং আল্লাহর গুণাবলির অনুসরণ করলে উত্তম চরিত্রবান হওয়া সম্ভব। নিম্নেবর্ণিত আলোচনায় আমরা আল্লাহ্ তায়ালার কতিপয় গুণের সাথে পরিচিত হব।

আল্লাহু গাফ্ফারুন (اَللّٰهُ غَفَّارٌ)

গাফ্ফার শব্দের অর্থ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ গাফ্ফারুন অর্থ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা অপরিসীম। তিনি সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল। তিনি বলেন-

وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ○

অর্থ : "এবং আমি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ইমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচল থাকে।" (সূরা তা-হা, আয়াত ৮২)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের বহু নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু অনেক মানুষই অহংকার ও মূর্খতাবশত আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যায়। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে শাস্তি দেন না, বরং সুযোগ দেন। বান্দা যদি তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে তবে তিনি মাফ করে দেন। বড় বড় পাপীও যদি তাওবা করে তাহলেও তিনি ক্ষমা করেন। তাঁর ক্ষমা তুলনাবিহীন।

আমরা জানা-অজানায় অনেক গুনাহ করে ফেলি। তাই সবসময় আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইব। তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহু সামাদুন (اَللّٰهُ الصَّمَدُ)

সামাদুন শব্দের অর্থ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহু সামাদুন অর্থ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আল কুরআনে তিনি নিজেই বলেছেন- اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থ: "আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।" (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ০২)

আল্লাহ তায়ালা খালিক বা সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত সবকিছুই মাখলুক বা সৃষ্টি। সকল সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। জন্ম-মৃত্যু, বেড়ে ওঠা সবকিছুর জন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার কুদরতের মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকল প্রয়োজন ও চাহিদার উর্ধ্বে। সব প্রকার লাভ-লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতি, দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত বা পবিত্র। বিশ্বজগৎ সৃষ্টিতে তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়নি। সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও তাঁর কোনো সাহায্যকারীর দরকার নেই। বড় বড় সাগর মহাসাগর, পাহাড় পর্বত তাঁর এক হুকুমেই তৈরি হয়ে যায়। জটিল জটিল সৃষ্টিও তাঁর 'হও' বলার সাথে সাথে অস্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং তিনি সাহায্যকারী ব্যতীতই মহান স্রষ্টা।

তাঁর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। এমনকি ইবাদত বন্দেগি ও প্রশংসারও তিনি মুখাপেক্ষী নন। মানুষের নিজের কল্যাণের জন্যই ইবাদত বন্দেগি করা প্রয়োজন। তিনি খাদ্য-পানীয়, নিদ্রা, বিশ্রাম ইত্যাদির উর্ধ্বে। এক কথায় তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী একমাত্র সত্তা।

আমরা আল্লাহ তায়ালার এ গুণ উপলব্ধি করব। নিজে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করব। পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করব। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট সাহায্য চাইব না।

আল্লাহু রাউফুন (اَللّٰهُ رَءُوْفٌ)

রাউফুন শব্দের অর্থ অতিশয় দয়াবান, পরম দয়ালু, অতি স্নেহশীল। আল্লাহু রাউফুন অর্থ- আল্লাহ অতি দয়াবান, অত্যন্ত স্নেহশীল। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার শেষ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৪৩)

আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দয়া ও করুণার শেষ নেই। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি দয়া ও স্নেহের মাধ্যমে আমাদের প্রতিপালন করেন। তিনি মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মায়া-ভালোবাসা সঞ্চার করে দেন। তাঁরা আমাদের সেবা দিয়ে বড় করেন। আমরা নাফরমানি করলেও তিনি দুনিয়াতে আমাদের তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না। বরং করুণাবশত আমাদের সুযোগ দেন। আমরা তাওবা করলে তিনি দয়া করে আমাদের ক্ষমা করেন। আমাদের রহমত ও বরকত দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতের সব কল্যাণই তাঁর দান। তিনি করুণা ও দয়ার আধার।

আমরাও আল্লাহ তায়ালার এ গুণের চর্চা করব। পরস্পরের প্রতি আমরা দয়াশীল হব। কাউকে আঘাত করব না। বরং স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে আপন করে নেব।

আল্লাহু হাসিবুন (اَللّٰهُ حَسِيْبٌ)

হাসিবুন অর্থ হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহু হাসিবুন অর্থ আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৮৬)

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। হাশরের ময়দানে তিনিই হবেন একমাত্র বিচারক। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ؕ

অর্থ : "তিনি (আল্লাহ) বিচার দিনের মালিক।" (সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত ৩)

সেদিন তিনি সব মানুষের হাতে আমলনামা প্রদান করবেন। আমলনামায় প্রত্যেকের সব কাজের হিসাব লেখা থাকবে। ছোট-বড়, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, গোপনে-প্রকাশ্যে কৃত সবধরনের কাজেরই সেদিন হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ

অর্থ : "যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তারও হিসাব নেবেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৪)

সবাইকেই সেদিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। পাপ পুণ্যের হিসাব না দিয়ে সেদিন কেউই রেহাই পাবে না। আল্লাহ তায়ালা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবারই হিসাব নেবেন। এজন্যই তিনি হাসিব বা সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী।

আমরা আল্লাহ তায়ালার এ গুণটির তাৎপর্য বুঝব। তারপর নিজেই নিজ আমলের হিসাব রাখব। প্রতিদিন রাতে ঐ দিনের পাপ-পুণ্যের হিসাব করব। অতঃপর পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং ভবিষ্যতে পাপ আর না করতে চেষ্টা করব।

আল্লাহু মুহাইমিনুন (اَللّٰهُ مُهَيْمِنٌ)

মুহাইমিনুন শব্দের অর্থ নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আশ্রয়দাতা। আল্লাহু মুহাইমিনুন অর্থ আল্লাহ আশ্রয়দাতা। আল্লাহ তায়ালা হলেন প্রকৃত রক্ষাকর্তা। তিনিই একমাত্র এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। আল্লাহ তায়ালাই আমাদের রক্ষক। তিনি আমাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তিনিই হেফাজত করেন। হিংসুক, জাদুকর, ষড়যন্ত্রকারী, সকলের অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। তাঁর সুরক্ষাই প্রকৃত সুরক্ষা। কেউ তাঁর সুরক্ষা ভেদ করতে পারে না। তিনি যাকে রক্ষা করেন কেউ তার কোনো

অনিষ্ট করতে পারে না। সবসময় সকল বিপদে তাঁরই আশ্রয় চাইতে হবে। আল কুরআন ও হাদিসের বহুস্থানে আমাদের এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.) তাঁর নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করব। তিনি আমাদের রক্ষা করবেন। আমরা বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করব, আশ্রয় দেব। ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর খুশি হবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহর ১৫টি গুণবাচক নাম অর্থসহ লিখে একটি তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

রিসালাত (اَلرِّسَالَةُ)

আকাইদের বিষয়সমূহের মধ্যে রিসালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাওহিদের পরই আসে রিসালাত। রিসালাত অর্থ সংবাদ বহন, খবর বা চিঠি পৌঁছানো। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালার বাণী, আদেশ- নিষেধ মানুষের নিকট পৌঁছানোকে রিসালাত বলে। যাঁরা এ সংবাদ পৌঁছানোর কাজ করেন তাঁরা হলেন নবি-রাসুল। রিসালাত ও নবি-রাসুলের ওপর বিশ্বাস করা ফরজ বা আবশ্যক।

নবি-রাসুলের সংখ্যা

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য বহু নবি-রাসুল এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি ছিল না যেখানে আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুল প্রেরণ করেন নি। আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

অর্থ : “আর প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।” (সূরা আর-রাদ, আয়াত ৭)

কুরআন মজিদে আমরা মাত্র ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম দেখতে পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। একটি হাদিসে হযরত আবুজর গিফারি (রা.) বলেন, “একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! নবিগণের সংখ্যা কত? উত্তরে মহানবি (স.) বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে তিন শত তের জন অপর বর্ণনা মতে তিন শত পনের জন হলেন রাসুল।” (মিশকাত)

আরেক বর্ণনা মতে নবিগণের সংখ্যা হলো দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.), আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)।

নবি-রাসুলের পার্থক্য

অর্থগত দিক থেকে এ দুটি শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যাঁদের প্রতি আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন কিংবা নতুন শরিয়ত প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন রাসুল। আর যার প্রতি কোনো

কিতাব অবতীর্ণ হয়নি কিংবা যাঁকে কোনো নতুন শরিয়ত দেওয়া হয়নি তিনি হলেন নবি। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত প্রচার করতেন। এ হিসেবে সকল রাসুলই নবি ছিলেন। কিন্তু সকল নবি রাসুল ছিলেন না। যেমন– আমাদের মহানবি (স.) ছিলেন একাধারে নবি ও রাসুল। অপরদিকে হযরত হারুন (আ.) ছিলেন মাত্র নবি। তাঁর প্রতি কোনো কিতাব নাজিল হয়নি। তিনি হযরত মুসা (আ.)-এর শরিয়ত প্রচার করতেন।

রিসালাতের তাৎপর্য

নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ। তাঁরা সকলকে তাওহিদের পথে ডাকতেন। কুফর, শিরক, নিফাক থেকে সতর্ক করতেন। উত্তম চরিত্র ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতেন। নবিগণের দাওয়াতের মূল কথা আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর বিধি-বিধান প্রচার করা। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ط

অর্থ : “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।” (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৭৩)

নবি-রাসুলগণের দায়িত্বকেই বলা হয় রিসালাত। এ রিসালাতের মর্ম বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ج

অর্থ: “আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।” (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

নবি রাসুলগণ আল্লাহ তায়ালার দেওয়া এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। যারা তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে তারা সফলকাম হয়েছে। আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয়নবি (স.) এর আনীত বিধান অনুসরণ করব, তাহলে আমরাও সফলকাম হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা রিসালাত পাঠটি নীরবে পড়বে অতঃপর রিসালাতের মর্ম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫
খতমে নবুয়ত

পরিচয়

খতম শব্দের অর্থ শেষ, সমাপ্ত। আর নবুয়ত অর্থ পয়গম্বারি, নবিগণের দায়িত্ব ইত্যাদি। সুতরাং খতমে নবুয়ত অর্থ নবিগণের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি বা নবুয়তের সমাপ্তি। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেন। এ ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে, আর হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়। নবুয়ত তথা নবি-রাসুল আগমনের এ ক্রমধারাটির সমাপ্তিকেই খতমে নবুয়ত বলা হয়।

যাঁর মাধ্যমে এ ক্রমধারা শেষ হয় তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন বা নবিগণের শেষজন। আর তিনি হলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)।

তাৎপর্য

আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি। তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পর আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেন নি আর কিয়ামত পর্যন্ত আসবেনও না। তাঁর মাধ্যমে নবি-রাসুলের আগমনের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খতমে নবুয়তের ওপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না।

খতমে নবুয়তের প্রমাণ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের ক্রমধারা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কুরআন-হাদিসের বহু স্থানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে আমরা খতমে নবুয়ত এর কিছু প্রমাণ স্পষ্টভাবে জানব।

আল কুরআনের দলিল

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি মহানবি (স.)-কে খাতামুন নাবিয়্যিন বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

অর্থ : "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি তো আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবি।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৪০)

হাদিস শরিফের দলিল

বহু হাদিসে খতমে নবুয়তের প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে আমরা এ সম্পর্কে কতিপয় হাদিস জানব–

১. মহানবি (স.) বলেন– اَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

   অর্থ: "আমিই শেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি আসবেন না।" (সহিহ মুসলিম)

২. রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- "রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি ও রাসুল আসবেন না।" (জামি তিরমিজি)

৩. নবি করিম (স.) বলেন- "বনি ইসরাইলে নবিগণই নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোনো নবি ইন্তিকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবি আসবেন না।" (সহিহ বুখারি)

৪. একটি হাদিসে মহানবি (স.) উপমার মাধ্যমে খতমে নবুয়ত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, "আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবিগণের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যে, এক লোক একটি দালান নির্মাণ করল। খুব সুন্দর ও লোভনীয় করে তা সজ্জিত করল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান ফাঁকা ছিল। লোকজন

দালানটির চারদিকে ঘুরে এর সৌন্দর্য দেখছিল আর বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল- "এ কোণে একটি ইট রাখা হয়নি কেন? বস্তুত আমিই সে ইট এবং আমি শেষ নবি।" (সহিহ বুখারি)

পুরো দালানে একটি ইট লাগানো বাকি ছিল। ইট লাগাতেই সে দালান পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নবুয়তও তেমনি একটি দালানের সদৃশ। সেই দালানের সর্বশেষ ইট মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁর মাধ্যমেই দালানের সর্বশেষ ইট লাগানো হয়। পরিপূর্ণ হয়ে গেল নির্মাণকাজ। ফলে নতুন করে দালানের আর কোথাও ইট লাগানোর প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ নবি আসারও দরকার পড়বে না।

যৌক্তিক প্রমাণ

যুক্তির মাধ্যমেও আমরা খতমে নবুয়তের প্রমাণ লাভ করতে পারি। যেমন- যুক্তির আলোকে দেখা যায় এক নবির পর অন্য নবি সাধারণত তিনটি কারণে আসতেন। যথা-

ক. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেলে ;

খ. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়লে কিংবা তাতে নতুন কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন হলে।

গ. পূর্ববর্তী নবির শিক্ষা কোনো বিশেষ স্থান বা কালের জন্য নির্দিষ্ট হলে।

উপরিউক্ত কারণগুলোর কোনোটিই বর্তমানকালে প্রযোজ্য নয়। কেননা-

১. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। এটি বিন্দুমাত্র বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়নি। সুতরাং নতুন কোনো নবি আসার প্রয়োজন নেই।

২. রাসুল (স.)-এর শিক্ষা এবং দীন ইসলাম পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। এতে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই। এতে কোনোরূপ সংযোজন ও বিয়োজনেরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

৩. নবি করিম (স.) কোনো বিশেষ স্থান বা কালের জন্য আসেন নি। বরং তিনি সর্বকালের সকলের নবি। কিয়ামত পর্যন্ত সকল স্থানের মানুষের নবি। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

অর্থ: "আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা সাবা, আয়াত ২৮)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থ : "বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল ।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৫৮)

নবি আগমনের তিনটি কারণের একটিও বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং নতুন কোনো নবি আগমনেরও প্রয়োজন নেই। আমাদের নবিই শেষ নবি। তিনিই খাতামুন নাবিয়্যিন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা খতমে নবুয়ত পাঠটি নীরবে পড়বে। শ্রেণির সকলে মিলে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবে। এবার তিনজনের একজন খতমে নবুয়তের ওপর কুরআনের দলিল, আরেকজন হাদিস শরিফের দলিল এবং অন্যজন যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখবে। তাদের বক্তব্য শ্রেণির সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। শিক্ষক মহোদয় সভাপতি ও সমন্বয়ক হিসেবে এ কাজে সহযোগিতা করবেন। সকলে অনুষ্ঠান শেষে বক্তাদের ধন্যবাদ জানাবে।

পাঠ ৬

আখিরাত

আখিরাত হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। বাংলা ভাষায় একে পরকাল বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের যে নতুন জীবন শুরু হয় তা-ই পরকাল বা আখিরাত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটি অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবন।

আখিরাত বা পরকালের দুটি পর্যায় রয়েছে। যথা-

ক. বারযাখ

খ. কিয়ামত।

বারযাখ

দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়কে বারযাখ বলে। মানুষের মৃত্যু থেকে কিয়ামত বা পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে বারযাখ বলে। এটি কিয়ামত ও দুনিয়ার জীবনের মধ্যবর্তী পর্দা স্বরূপ। মানুষের মৃত্যুর পর এ জীবনের শুরু হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

অর্থ : "আর তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ যা পুনরুত্থান পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।" (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১০০)

বারযাখ হলো কবরের জীবন। এটি আখিরাতের সর্বপ্রথম পর্যায়। বারযাখ জীবনে মানুষ দুনিয়ার ভালো আমলের কারণে শান্তি ভোগ করবে আর খারাপ আমলের জন্য শাস্তি ভোগ করবে।

কিয়ামত

কিয়ামত অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া, ওঠা। ইসলামি পরিভাষায় কবর থেকে মানুষ উঠে সেদিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে, তাই একে বলা হয় কিয়ামত। কিয়ামতে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। এরপর নেককারদের জান্নাতে এবং পাপীদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

গুরুত্ব

আখিরাত আকাইদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আখিরাতের প্রতি ইমান আনা অপরিহার্য। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না। মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○ؕ

অর্থ : "আর তারা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল করে তোলে। এর ফলে মানুষ উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার গুণাবলি অনুশীলন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

অর্থ : "আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ২২)

আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে। ফলে যেকোনো উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করতে চায়। অন্যায়, অত্যাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ সবকিছুই তার দ্বারা সংঘটিত হয়। যেকোনো পাপ করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এরূপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং পবিত্র করে তোলে।

সুতরাং আমরা আখিরাতে বিশ্বাস করব এবং নৈতিক ও পূত-পবিত্র জীবনযাপন করব।

কাজ : এই পাঠ শেষে আখিরাত সম্পর্কে শিক্ষার্থী যা শিখল তা লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

শাফাআত

শাফাআত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নবি-রাসুলগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। কিয়ামতের দিন শাফাআত সাধারণত দুটি কারণে করা হবে। যথা-

ক. পাপীদের ক্ষমা ও পাপ মার্জনার জন্য।

খ. পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভের জন্য।

তাৎপর্য

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের সব কাজকর্মের হিসাব নেবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন। এ সময় পুণ্যবানগণ জান্নাত লাভ ও পাপীরা জাহান্নাম ভোগ

করবে। নবি-রাসুল ও পুণ্যবান বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন। ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে। এরপর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

আবার অনেক পুণ্যবানের জন্যও এদিন শাফাআত করা হবে। ফলে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

শাফাআত সাধারণত দুই প্রকার। যথা-

ক. শাফাআতে কুবরা

খ. শাফাআতে সুগরা

শাফাআতে কুবরা

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে। সেদিন সূর্য খুব নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপতিত থাকবে। এ সময় তারা হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআত করতে অনুরোধ করবে। তাঁরা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করবেন। এ সময় সকল মানুষ মহানবি (স.)-এর নিকট উপস্থিত হবে। তখন মহানবি (স.) আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হিসাব-নিকাশ শুরু করবেন। এ শাফাআতকে বলা হয় শাফাআতে কুবরা। একে শাফাআতে উযমাও (সর্বশ্রেষ্ঠ শাফাআত) বলা হয়।

এরূপ শাফাআতের অধিকার একমাত্র মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর থাকবে। এ ছাড়া নবি করিম (স.)- জান্নাতিগণকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবেন। এর পরই কেবল জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

শাফাআতে সুগরা

কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। এটাই হলো শাফাআতে সুগরা। নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ, আলিম, হাফিজ এ শাফাআতের সুযোগ পাবেন। আল কুরআন ও সিয়াম (রোযা) কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে শাফাআতে সুগরা করা হবে।

১. যেসব মুমিন পাপের কারণে জাহান্নামের যোগ্য তাদের মাফ করে জান্নাতে দেয়ার জন্য শাফাআত।

২. যেসব মুমিন পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য শাফাআত।

৩. জান্নাতিগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য শাফাআত।

আমরা শাফাআতে বিশ্বাস স্থাপন করব। আল্লাহকে ভালোবাসব, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ অনুযায়ী চলব। ফলে পরকালে প্রিয়নবি (স.)-এর শাফায়াত লাভ করে জান্নাতে যাব।

কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা এসব শাফাআত কবুল করবেন এবং বহু মানুষকে জান্নাত দান করবেন। তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর অধিকারে। তিনি নিজেই বলেছেন-

أُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ

অর্থ : "আমাকে শাফাআত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।" (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন- পৃথিবীতে কত ইট ও পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত করব। (মুসনাদ আহমদ)

শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত। মহানবি (স.)-এর শাফাআত ব্যতীত কিয়ামতের দিন সফলতা, কল্যাণ ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং আমরা প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শাফাআতে বিশ্বাস করব। তাঁকে ভালোবাসব ও পূর্ণরূপে অনুসরণ করব। তাহলে আমরা তাঁর শাফাআত লাভে সক্ষম হব।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হবে। এবার একদল শাফাআতের পরিচয় ও তাৎপর্য বলবে এবং অন্যদল প্রকারভেদ বর্ণনা করবে।

পাঠ ৮

জান্নাত

জান্নাত শব্দের অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান। ফারসি ভাষায় একে বলা হয় বেহেশত। বাংলায় একে বলা হয় স্বর্গ। ইসলামি পরিভাষায়, আখিরাতে ইমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চিরশান্তির আবাসস্থল তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে জান্নাত বলা হয়।

জান্নাত হলো চিরশান্তির স্থান। সেখানে সবকিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুসজ্জিত। জান্নাতের ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্রসহ সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য, মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত। জান্নাতে থাকবে রেশমের গালিচা, দুধ ও মধুর নহর। মিষ্টিপানির স্রোতধারা। বস্তুত আনন্দ উপভোগের সব রকমের জিনিসই জান্নাতে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝

অর্থ : "সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই তোমাদের জন্য রয়েছে আর তোমরা যা দাবি করবে তাও তোমাদের দেওয়া হবে।" (সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ, আয়াত ৩১)

জান্নাতের বিবরণ দিয়ে রাসুল (স.) বলেন- "আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চোখ কোনোদিন দেখে নি, কোনো কান কোনোদিন শোনে নি, আর মানুষের অন্তরও যা কোনোদিন কল্পনা করতে পারে নি।" (মিশকাত)

জান্নাতের নাম

জান্নাত মোট আটটি। এগুলো হলো-

১. জান্নাতুল ফিরদাউস
২. জান্নাতুল মাওয়া
৩. দারুল মাকাম
৪. দারুল কারার
৫. দারুন নাইম
৬. দারুল খুলদ
৭. দারুস সালাম
৮. জান্নাতু আদন।

এ আটটি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

জান্নাত লাভের আমল ও উপায়

জান্নাত হলো মুমিনদের ও পুণ্যবানদের বাসস্থান। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط

অর্থ : "(হে নবি!) যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫)

সুতরাং জান্নাত লাভের জন্য দুনিয়াতে সর্বপ্রথম ইমান আনতে হবে। আকাইদের সব বিষয়ের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। অতঃপর নেক কাজ করতে হবে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন-

اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ-

অর্থ : সালাত হলো জান্নাতের চাবি।

নামাযের পাশাপাশি রমযানের রোযা পালন, যাকাত আদায় ও হজ করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য সৎকাজ, উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার অনুশীলন করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ؕ

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে এবং নিজকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, নিঃসন্দেহে জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।" (সূরা আন-নাযিআত, আয়াত ৪০-৪১)

সুতরাং আমরা সব সময় নেক আমল করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ অমান্য করব না। তাহলেই আমরা আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে পারব।

কাজ :	শিক্ষার্থীরা–
	ক. জান্নাতের নামগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।
	খ. জান্নাত লাভের উপায় সম্পর্কে ৫টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৯

জাহান্নাম

জাহান্নাম হলো আগুনের গর্ত, শাস্তির স্থান। একে দোযখ বা নরকও বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় আখিরাতে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের শাস্তির জন্য যে স্থান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে তাকে জাহান্নাম বলা হয়।

জাহান্নাম খুবই ভয়ংকর স্থান। সেখানে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। সেখানে পাপীরা আগুনে দগ্ধ হবে। বড় বড় সাপ, বিচ্ছু, কীটপতঙ্গ মানুষকে দংশন করবে। জাহান্নামের আগুন হবে আমাদের দুনিয়ার আগুন থেকে সত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত। জাহান্নামিদের খাদ্য হবে যাক্কুম নামক বড় বড় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। যা তারা খেতে পারবে না, বরং গলায় আটকে যাবে। তাদের পানীয় হবে দোযখিদের উত্তপ্ত রক্ত ও পুঁজ। সেখানে মানুষের কোনো মৃত্যু হবে না, বরং শাস্তি পেতে থাকবে এবং চিরকাল ধরে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। জাহান্নামের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ط

অর্থ : "যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে অচিরেই আমি তাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করাব। সেখানে যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই এর স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে পারে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৬)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي
بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۝ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۝ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

অর্থ : "যারা কুফুরি করে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। এর দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদের পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে- স্বাদ গ্রহণ কর দহন-যন্ত্রণার।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ১৯-২২)

জাহান্নামের নাম

জাহান্নাম মোট সাতটি। এগুলো হলো-

১. জাহান্নাম ২. হাবিয়া ৩. জাহিম ৪. সাকার ৫. সাইর ৬. হুতামাহ ৭. লাযা।

জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উপায়

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের প্রতি যারা ইমান আনে না তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তাছাড়া যেসব লোক দুনিয়ায় অন্যায় ও পাপ কাজ করবে তারাও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। অশ্লীল ও অনৈতিক কাজ করলেও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং আমরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করব। তাহলে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা-

ক. জাহান্নামের নামগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খ. জাহান্নামের পরিচয় এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

কিতাব অবতীর্ণ হয়নি কিংবা যাঁকে কোনো নতুন শরিয়ত দেওয়া হয়নি তিনি হলেন নবি। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত প্রচার করতেন। এ হিসেবে সকল রাসুলই নবি ছিলেন। কিন্তু সকল নবি রাসুল ছিলেন না। যেমন– আমাদের মহানবি (স.) ছিলেন একাধারে নবি ও রাসুল। অপরদিকে হযরত হারুন (আ.) ছিলেন মাত্র নবি। তাঁর প্রতি কোনো কিতাব নাজিল হয়নি। তিনি হযরত মুসা (আ.)-এর শরিয়ত প্রচার করতেন।

রিসালাতের তাৎপর্য

নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ। তাঁরা সকলকে তাওহিদের পথে ডাকতেন। কুফর, শিরক, নিফাক থেকে সতর্ক করতেন। উত্তম চরিত্র ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতেন। নবিগণের দাওয়াতের মূল কথা আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর বিধি-বিধান প্রচার করা। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ

অর্থ : "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৭৩)

নবি-রাসুলগণের দায়িত্বকেই বলা হয় রিসালাত। এ রিসালাতের মর্ম বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ

অর্থ: "আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

নবি রাসুলগণ আল্লাহ তায়ালার দেওয়া এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। যারা তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে তারা সফলকাম হয়েছে। আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয়নবি (স.) এর আনীত বিধান অনুসরণ করব, তাহলে আমরাও সফলকাম হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা রিসালাত পাঠটি নীরবে পড়বে অতঃপর রিসালাতের মর্ম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫
খতমে নবুয়ত

পরিচয়

খতম শব্দের অর্থ শেষ, সমাপ্ত। আর নবুয়ত অর্থ পয়গম্বারি, নবিগণের দায়িত্ব ইত্যাদি। সুতরাং খতমে নবুয়ত অর্থ নবিগণের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি বা নবুয়তের সমাপ্তি। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেন। এ ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে, আর হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়। নবুয়ত তথা নবি-রাসুল আগমনের এ ক্রমধারাটির সমাপ্তিকেই খতমে নবুয়ত বলা হয়।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দু'দলে ভাগ হয়ে যাবে। এবার প্রত্যেক দল থেকে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবে। "প্রকৃত ইমানই কেবল মানুষকে নীতি-নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে" বিষয়ের পক্ষে একদল এবং বিপক্ষে একদল অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করবে। শ্রেণিশিক্ষক সঞ্চালক হিসেবে থাকবেন।

বিতর্ক শেষে বিজয়ী দলকে এবং উভয় দলের মধ্যে যে বক্তা বিতর্কে যুক্তিপূর্ণ ভালো বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, তাকে সবাই মিলে ধন্যবাদ জানাবে। সম্ভব হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই —— বলা হয়।

২. ইমানের —— দিক রয়েছে।

৩. আসমানি কিতাব সর্বমোট —— খানা।

৪. আল্লাহু মুহাইমিনুন অর্থ —— ।

৫. শাফাআত সাধারণত —— প্রকার।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. শাফাআত একটি	পরকাল
২. ইমান আল্লাহর একটি	বড় নিয়ামত
৩. মুনাফিকরা নিশ্চয়ই	বিরাট নিয়ামত
৪. আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা	অপরিসীম
৫. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলে	মিথ্যাবাদী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাসের প্রয়োজন কেন?

২. নিফাক বলতে কী বোঝায়?

৩. শাফাআত বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ইমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৩. নৈতিক চরিত্র গঠনে ইমানের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমানের মৌলিক বিষয় কয়টি?

ক. তিনটি খ. পাঁচটি

গ. সাতটি ঘ. আটটি।

২. নিফাকের ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় –

i. অশান্তি

ii. ঝগড়া বিবাদ

iii. মতৈক্য

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সাকিব ও সানিদ একই অফিসে চাকরি করে। সাকিব যথাসময়ে অফিসে আসে এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। সানিদ সুযোগ পেলেই বিভিন্ন অজুহাতে নির্দিষ্ট সময়ের পর অফিসে আসে এবং কাজেকর্মে ফাঁকি দেয়।

৩. সাকিবের একনিষ্ঠতার পেছনে কোন বিশ্বাসটি কাজ করছে?

ক. তাকদির খ. আখিরাত

গ. হাশর ঘ. মিযান।

৪. সানিদের কার্যক্রমের ফলে সে পাবে –

i. শাস্তি

ii. তিরস্কার

iii. নিন্দা

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুমাইয়া ও সামিয়া দুই বান্ধবী। নুহাশপল্লীতে বেড়াতে যাবে বলে দুজনেই দিন-তারিখ ঠিক করে। সুমাইয়া নির্দিষ্ট তারিখে প্রস্তুতি নিয়ে সামিয়ার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু সামিয়া তার বাবার কাছ থেকে টিফিন, কাগজ ও কলমের অজুহাত দিয়ে বেশ কিছু টাকা নিয়ে আদিবার সাথে মার্কেটে ঘুরতে চলে যায়। পরদিন সামিয়ার সাথে সুমাইয়ার দেখা হয়। সুমাইয়া বিষয়টি উত্থাপন করলে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং উভয়ই মনঃক্ষুণ্ন হয়।

ক. মুনাফিকের চিহ্ন কয়টি?

খ. তাকদিরে বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়?

গ. সামিয়ার আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুমাইয়ার কার্যক্রমের ফলাফল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২. মনসুর সাহেব ও ইকবাল সাহেব একই অফিসে চাকরি করেন। ইকবাল সাহেব একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। অফিসের সবার সাথেই তিনি ভদ্রভাবে কথা বলেন। একদিন মনসুর সাহেব তার অধীনস্ত কর্মচারী রাশেদকে এক গ্লাস পানি ও ফাইল আনতে বলেন। রাশেদ আসতে দেরি করায় মনসুর সাহেব তার সাথে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন। বিষয়টি অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানতে পেরে বলেন, 'মুমিন ব্যক্তির আচরণ এরূপ হতে পারে না।'

ক. জান্নাতের স্তর কয়টি?

খ. জাহান্নামের শাস্তির ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা কর।

গ. মনসুর সাহেবের আচরণটি কিসের পরিপন্থী ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উক্তিটি কি যথার্থ ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

আল্লাহ তাআলার দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করে জীবন পরিচালনাকে ইসলামি পরিভাষায় ইবাদত বলে। ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয় যথা : কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ যথাযথ পালনের নাম ইবাদত। আবার মানব জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধিবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর সকল সৃষ্টবস্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- যাকাতের ধারণা, যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত ও যাকাতের মাসারিফ বর্ণনা করতে পারব।
- যাকাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হজের ধারণা, পটভূমি, তাৎপর্য, ফজিলত, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতসমূহ ও নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- হজ পালনের ত্রুটি এবং তা সংশোধনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কুরবানির ধারণা, পটভূমি ও নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে ত্যাগ ও উদারতা অর্জনে কুরবানির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আকিকার ধারণা ও আদায়ের নিয়ম বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

'যাকাত' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ধনী ব্যক্তিদের নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ সম্পদ থাকলে নির্দিষ্ট অংশ গরিব অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াকে যাকাত বলে।

'যাকাত' প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তিবিশেষের হাতে পুঞ্জীভূত থাকে না। আর মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকুক আল্লাহ তায়ালা তা পছন্দ করেন না। তিনি চান সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয় হোক, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হোক। এ বিবেচনায় যাকাত অর্থ বৃদ্ধি। যাকাত প্রদানে দাতার অন্তর কৃপণতার কলুষ থেকে পবিত্র হয়। বিত্তশালীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার আছে। কাজেই গরিবের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দিলে অবশিষ্ট সম্পদ ধনীদের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। এদিক বিবেচনায় যাকাত অর্থ পবিত্রতা। যাকাত দিলে সম্পদে আল্লাহ বরকত দান করেন। ইসলামের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রুকনের মধ্যে যাকাত অন্যতম।

কুরআন মজিদের বহু জায়গায় সালাতের সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ : "আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত ২০)

যাকাত হলো দরিদ্রের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। ধনীদের দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং এটি আদায় করা ধনীদের ওপর ফরজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

অর্থ : "তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (আয্-যারিয়াত, আয়াত ১৯)

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নামায আদায় করলে, আদায়কারীর জন্য যেমন পুরস্কারের ঘোষণা আছে, তেমনি যাকাত (ফরজ হলে) আদায়কারীর জন্যও সুসংবাদ রয়েছে। যেমন, যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয় এবং সম্পদে আল্লাহ তায়ালা বরকত দেন। যাকাত প্রদানকারীদের আখিরাতে অধিক পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হবে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। হাদিসে কুদসিতে আছে, "আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে বলেন, হে বনি আদম! আমার পথে খরচ করতে থাক। আমি আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তোমাদের দিতে থাকব" (বুখারি ও মুসলিম)।

যাকাত আদায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ

অর্থ : "আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ১২)

যাকাত দানকারীর পুরস্কার ও কৃপণ ব্যক্তির দুঃসংবাদ সম্পর্কে অন্য এক হাদিসে আছে, "দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, আল্লাহর বান্দাদের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। অপরদিকে কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাদের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে। একজন জাহিল দানশীল একজন কৃপণ আবিদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি পছন্দনীয়।" (তিরমিজি)

কেউ যদি সম্পদ জমা করে রাখে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে: আর যারা সোনা রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে কপালে, পাঁজরে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে, সেদিন বলা হবে এ তো সে সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। এখন সে সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর। (সূরা আত্-তাওবা: ৩৪-৩৫)

যাকাত ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যারা তা আদায় করে না এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে ইসলামি বিধান হচ্ছে, পার্থিব জীবনে তারা কৃপণ হিসেবে আখ্যায়িত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন : "আর ধ্বংস ঐসব মুশ্‌রিকের জন্য, যারা যাকাত দেয় না ও আখিরাতকে অস্বীকার করে।" (সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা: ৬-৭)

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করল। খলিফা তাদের ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমতুল্য মনে করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, মহানবি (স.)-এর যুগে যারা যাকাত দিত, তাদের মধ্যে কেউ যদি একটি ছাগলের বাচ্চা দিতেও অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বক্তব্যের যৌক্তিকতার সাথে নিম্নবর্ণিত হাদিসের বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। হাদিসে আছে, "আল্লাহর কসম, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব।" (বুখারি)

প্রত্যেক মুমিন বান্দার উচিত পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় যথানিয়মে যাকাত আদায় করা। অন্যকে যাকাত দানে উৎসাহিত করা। ইসলামি বিধানমতো যাকাত আদায় করে সমাজের অসহায় দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাকাত প্রদানের সুফল সম্পর্কে আলোচনা করবে।

পাঠ ২

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত (شَرَائِطُ فَرْضِيَّةِ الزَّكٰوةِ)

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত সাতটি। শর্তগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

১. **মুসলমান হওয়া :** যাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মুসলমান হওয়া। অমুসলিমদের ওপর যাকাত ফরজ নয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার অতীত জীবনের যাকাত দিতে হবে না। যেদিন মুসলমান হবে সেদিন থেকে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

২. **নিসাবের মালিক হওয়া :** যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে শরিয়তে যাকাত ফরজ হয়, সে পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া।

৩. **নিসাব পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া :** যেসব দ্রব্যের ওপর মানুষের জীবনযাপন নির্ভর করে, সেসব জিনিসপত্রকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে। যেমন : খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বসবাসের বাড়িঘর, পেশাজীবীর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। যানবাহনের নৌকা, সাইকেল, মোটর, পশু, কৃষিকাজের সরঞ্জাম, পড়ালেখার সরঞ্জাম এসবও প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর ওপর যাকাত ফরজ হবে না।

৪. **ঋণগ্রস্ত না হওয়া :** ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তার ওপর যাকাত ফরজ হবে না। কারণ সে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনেই ঋণ গ্রহণ করেছে। তবে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ কারো হাতে থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

৫. **মাল এক বছরকাল স্থায়ী থাকা :** নিসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তির হাতে এক বছর কাল স্থায়ী না হলে, তার ওপর যাকাত ফরজ হয় না। হাদিসে আছে, "ঐ সম্পদে যাকাত নেই যা পূর্ণ এক বছর মালিকানায় না থাকে। (ইবনে মাজাহ)

৬. **জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া :** যাকাত ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। জ্ঞানবুদ্ধিহীন তথা পাগলের ওপর যাকাত ফরজ নয়।

৭. **বালেগ হওয়া :** যাকাতদাতাকে অবশ্যই বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। শিশু, নাবালেগ যত সম্পদের মালিকই হোক না কেন, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার ওপর যাকাত ফরজ হয় না।

যাকাতের নিসাব (نِصَابُ الزَّكٰوةِ)

'নিসাব' আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ। শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলে। সারাবছর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে যার হাতে নিসাব পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তাকে বলা হয় সাহিবে নিসাব বা নিসাবের মালিক। আর সাহিবে নিসাবের ওপরই যাকাত ফরজ। নিসাবের পরিমাণ হলো, সোনা কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা অথবা রুপা কমপক্ষে সাড়ে বায়ান্ন তোলা অথবা ঐ মূল্যের অর্থ বা সম্পদ। ঐ পরিমাণ সম্পদ কারো নিকট পূর্ণ এক বছরকাল স্থায়ী থাকলে ঐ সোনা, রুপা বা সম্পদের মূল্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দেওয়া ফরজ। কিন্তু সম্পদ নিসাবের কম থাকলে যাকাত দেওয়া ফরজ নয়। এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে না। কারো হাতে যদি বছরের প্রথমে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, বছরের মাঝে কোনো কারণে নিসাব হতে কমে যায় এবং বছর শেষে আবার নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে গেলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য সোনা, রুপার অলংকার জীবনের আবশ্যকীয় মৌলিক বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই অলংকার নিসাব পরিমাণ হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। সোনা, রুপা ব্যতীত অন্য কোনো ধাতু যথাঃ তামা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিস হিসাবে থাকলে যাকাত দিতে হবে না। তবে ব্যবসায়ের সামগ্রী হলে যাকাত দিতে হবে। এর জন্য শর্ত হচ্ছে এসব সামগ্রী এক বছরকাল হাতে স্থায়ী থাকা এবং নিসাব পরিমাণ হওয়া।

উৎপন্ন শস্যের যাকাত

ধান, গম, যব, খেজুর ইত্যাদি শস্য সেচ প্রদান ছাড়া বৃষ্টির পানিতে জন্মালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। একে উশর বলা হয়। আর সেচ ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাকাতের নিসাব সম্পর্কে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩

যাকাতের মাসারিফ (مَصَارِفُ الزَّكٰوةِ)

মাসারিফ আরবি শব্দ। এর অর্থ ব্যয় করার খাত। শরিয়তের পরিভাষায় ইসলামি বিধান অনুযায়ী যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায়, তাদেরকে বলা হয় যাকাতের মাসারিফ। যাকাতের মাসারিফ অর্থাৎ কোন কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন মজিদে বলা হয়েছেঃ

"যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য, ইহা আল্লাহর বিধান।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ৬০)

যাকাতের মাসারিফ আটটি :

১. অভাবগ্রস্ত বা ফকির।

২. সম্বলহীন, মিসকিন।

৩. যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ।

৪. মন জয় করার উদ্দেশ্যে।

৫. মুক্তিকামী দাস।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

৭. আল্লাহর পথে অর্থাৎ ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তি।

৮. মুসাফির বা অসহায় প্রবাসী পথিক।

নিচে মাসারিফের বিবরণ দেওয়া হলো :

১. **অভাবগ্রস্ত বা ফকির :** ফকিরকে বাংলায় গরিব বলা হয়। যাদের কিছু না কিছু সম্পদ আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। যাদের জীবনধারণের জন্য অপরের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর নির্ভর করতে হয়, এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যায়। জীবিকা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি, পঙ্গু, ইয়াতিম শিশু, বিধবা, স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল এবং যারা দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার এমন লোকদের সাময়িকভাবে যাকাতের খাত থেকে সাহায্য করা যায়।

২. **মিসকিন :** যারা নিঃস্ব, নিজের পেটের অন্নও যোগাড় করতে পারে না এবং অভাবগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও সম্মানের ভয়ে কারো দ্বারস্থ হয় না, তাদের মিসকিন বলে। মিসকিন সম্পর্কে হাদিসে আছে, "যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদ পায় না, অথচ আত্মসম্মানের ভয়ে সে এমনভাবে চলে যে, তাকে অভাবী বলে বোঝাও যায় না, যাতে লোকেরা তাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। আর সে সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাতও পাতে না, কিছু চায়ও না।" (বুখারি ও মুসলিম)। মিসকিনকে যাকাত দেওয়া যায়।

৩. **যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ :** যারা যাকাত আদায় করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, বণ্টন করে ও হিসাবপত্র রাখে, তাদের যাকাতের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী বলে। তারা আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন হলেও যাকাত থেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে।

৪. **মন জয় করার উদ্দেশ্যে :** সদ্য মুসলমান হওয়া ব্যক্তির সমস্যা দূরীকরণে এবং ইসলামের ওপর অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে তাদের যাকাত দেওয়া যাবে। ইসলামি পরিভাষায় তাদের 'মুআল্লাফাতুলকুলুব' বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ জাতীয় লোককে যাকাত দেওয়ার বিধান ছিল।

৫. **মুক্তিকামী দাস :** যে দাস তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে মুক্তি পাওয়ার চুক্তি করেছে এমন দাসকে মুক্তির মূল্য পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করা যেতে পারে। বর্তমানে ইসলামে ক্রীতদাস প্রথা চালু নেই বিধায় এ খাতে যাকাতের অর্থ বণ্টন করা হয় না।

৬. **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম, তাদের যাকাত দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে সাহায্য করা যায়।

৭. **আল্লাহর পথে :** এর আরবি পরিভাষা হলো 'ফি সাবিলিল্লাহ'। এটির অন্য অর্থ জিহাদ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং কুফরি ব্যবস্থাকে নির্মূল করে ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলে। যে কোনো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সংগ্রামই এক প্রকার জিহাদ। এরূপ ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিকে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায়।

৮. **অসহায় প্রবাসী পথিক :** কোনো ব্যক্তি সফরে গিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়লে বা যাত্রাপথে আর্থিক বিপদে পড়লে সাময়িকভাবে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'যাকাতের মাসারিফ'-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত থাকলে, সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হবে। আবার ধনীরাও তাদের দায়মুক্ত হওয়ার বিশেষ সুযোগ পাবে। কাজেই ইসলামে যাকাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নে যাকাতের কতিপয় গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

১. যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

যাকাতের অন্যতম গুরুত্ব হলো অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। সমাজের কেউ সম্পদের পাহাড় গড়বে, সুউচ্চ ইমারতে বসবাস করবে, বিলাসবহুল জীবনযাপন করবে, আর কেউ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাবে এমন বিধান ইসলামে নেই। কেউ শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে না, আর

বাড়ি বাড়ি ঘুরবে, শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করে না। কাজেই সকল শ্রেণির নাগরিকের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইসলাম ধনীদের ওপর যাকাত ফরজ করেছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "আল্লাহ তায়ালা লোকের ওপর সাদাকা (যাকাত) ফরজ করেছেন। তা নেওয়া হবে ধনীদের থেকে এবং বিলিয়ে দেওয়া হবে দুঃস্থদের মধ্যে।" (বুখারি ও মুসলিম)

সাধারণত মানুষের অর্থের প্রতি লিপ্সা থাকে। যে কৃপণ স্বভাবের হয়, সে নিজের কষ্টে উপার্জিত অর্থ নিঃস্বার্থভাবে কাউকে দিতে চায় না। তাই দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা সম্পদশালী ব্যক্তিদের মনকে সম্পদের লিপ্সা, লোভ, কৃপণতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষের মনকে দয়া-মায়া, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণসম্পন্ন করে তোলার জন্য তাদের ওপর যাকাত ফরজ করে দিয়েছেন।

সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তায়ালা। মানুষের নিকট তা আমানতস্বরূপ। মানুষ শ্রম ও মেধার দ্বারা সম্পদ অর্জন করবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদ খরচ করবে। কিন্তু সম্পদ জমা করে রাখা বা কেবল নিজের ভোগবিলাসের জন্য খরচ করা ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ ধনীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার আছে, তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। গরিবের অধিকার আদায় করলে মালিক দায়মুক্ত হবে, সম্পদ পবিত্র হবে; অন্যথায় সম্পদ হালাল হবে না। ইসলামি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ সমর্থন করা হয় না। যাকাত প্রথার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করা হতো। আদায়কৃত মালের বিতরণও সরকারি ব্যবস্থাপনায় হতো। নিসাবের নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের মালিকরা যাকাত দিতে বাধ্য থাকত। অন্যদিকে যারা যাকাত পাওয়ার হকদার (দাবিদার) তারা সবাই যাকাতের অর্থ পেয়ে উপকৃত হতো।

কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মোতাবেক যাকাত আদায় ও বিতরণ করা মুসলমানদের একটি পবিত্র দায়িত্ব। এ ব্যবস্থাপনার ওপর মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমে আসবে; কেউ বেকার থাকবে না। বরং মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। অসহায় গরিব মানুষকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা একটি মানবিক দায়িত্ব। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে এ মানবিক গুণের বিকাশ ঘটবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'যাকাতের অর্থনৈতিক' গুরুত্বের ওপর আলোচনা করবে।

২. যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব

যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূর হয়। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আল্লাহর নির্দেশমতো যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করলে সমাজের কোনো লোক অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন থাকবে না। কেউ না খেয়ে থাকবে না। কেউ বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না।

সম্পদশালী ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাকাত ও সাদাকার (দানের) অর্থে অভাবীদের প্রয়োজন মিটিয়েও অনেক জনহিতকর এবং কল্যাণমূলক কাজ করা যায়। বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। স্বাস্থ্যবান দরিদ্র শ্রমিককে তার শ্রমের উপযোগী উপকরণ দেওয়া সম্ভব হয়। দরিদ্রের জন্য সেবামূলক

অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন ইয়াতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করা যায়। এমনিভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে এমন এক সময় আসবে যখন যাকাত গ্রহণ করার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামের প্রথম যুগে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর যুগের কথা উল্লেখ করা যায়। ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে, তাঁর যুগে যাকাত নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা গোটা সমাজকে কৃপণতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি বদভ্যাস থেকে পবিত্র রাখে এবং পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, ত্যাগ, মমত্ববোধ ইত্যাদি গুণ আরও সুদৃঢ় করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'যাকাতের সামাজিক গুরুত্বের' ওপর আলোচনা করবে।

পাঠ ৫

হজ (اَلْحَجُّ)

'হজ' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় নির্দিষ্ট দিনসমূহে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করাকে হজ বলে। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। যিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত মক্কা, মিনা, আরাফা এবং মুয্দালিফায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করাও হজের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নরনারীর ওপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ফরজ। এরপর যতবার হজ করবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে এবং অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবে। হজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

যেসব লোক কাবাঘর পর্যন্ত যাতায়াতের দৈহিক ক্ষমতা রাখে এবং হজ হতে ফিরে আসা অবধি পরিবারবর্গের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম, তাদের ওপর হজ ফরজ। মহিলা হাজি হলে একজন সঙ্গী থাকতে হবে। সঙ্গী হবেন স্বামী অথবা এমন আত্মীয় যার সাথে বিবাহ সম্পর্ক হারাম। যেমনঃ বাবা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা ইত্যাদি। সফরসঙ্গীর ব্যয়ভার মহিলা হাজিকেই বহন করতে হবে।

হজের ঐতিহাসিক পটভূমি

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম। সালাত আদায় ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্য পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মক্কা নগরীতে যে ঘর (ইবাদতখানা) তৈরি হয়, তার নাম 'বাইতুল্লাহ' বা আল্লাহর ঘর। কালক্রমে এ পবিত্র ঘর জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে।

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ইরাকে জন্ম নেওয়া আল্লাহর নবি হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশে বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কাবাঘরের নিকটবর্তী জনমানবশূন্য স্থানে রেখে যান। বিবি হাজেরা স্বামীকে লক্ষ করে বললেন : "আমাদের এমন মরু প্রান্তরে ফেলে রেখে কেন চলে যান?" উত্তরে স্বামী বললেন, "আল্লাহর নির্দেশ।" বিবি হাজেরা বললেন, "তাহলে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তিনি অবশ্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন।" যাওয়ার সময় হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) তাঁদের জন্য দোয়া করলেন।

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও যেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (সূরা ইব্‌রাহিম, আয়াত ৩৭)

নবি ইব্‌রাহিম (আ.)-এর প্রার্থনা আল্লাহ তায়ালা কবুল করলেন।

হযরত ইব্‌রাহিম (আ.)-এর রেখে যাওয়া সামান্য খাদ্য ও পানীয় কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। মা ও শিশু পুত্র ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর। মা হাজেরা নিকটস্থ সাফা পাহাড়ে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন, আবার মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারিদিকে তাকান, কোথাও কোনো কাফেলা দেখা যায় কি না, যাতে তাদের নিকট থেকে সামান্য পানি নিয়ে পিপাসা কাতর পুত্রের মুখে দেওয়া যায়। কিন্তু কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্নও দেখা গেল না। এমনিভাবে সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করলেন। তারই নিদর্শনস্বরূপ হাজিগণ ঐ স্থানে (সাঈ) দ্রুত হাঁটেন। মা হাজেরা কোথাও পানির সন্ধান না পেয়ে শিশুর কাছে ফিরে এসে বিস্ময়ে দেখলেন, নিকটেই মাটি ফুঁড়ে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা বইছে। এ পানির ফোয়ারাই ছিল বিখ্যাত যম্‌যম্ কূপের উৎস। বিবি হাজেরা শিশু ইসমাঈলকে পানি পান করিয়ে তার তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। নিজেও তৃপ্তিসহকারে পানি পান করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। মরুভূমিতে যেখানে পানি থাকে সেখানে আকাশে পাখি ওড়ে। দূর হতে তা দেখে কাফেলা এসে জমা হয়। জুরহুম বংশের এক বাণিজ্য কাফেলা এসে মা হাজেরার অনুমতি নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করল। ক্রমে আরও লোকজন এসে জড়ো হলো। সকলের বিশ্বাস, এ পুণ্যাত্মা মা ও শিশুর কল্যাণেই আল্লাহ তায়ালা এ ঊষর মরুর বুক চিরে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছেন। ধীরে ধীরে মক্কা একটি জনপদে পরিণত হলো।

হযরত ইসমাঈল যখন কিশোর বয়সে উপনীত হলেন তখন ইব্‌রাহিম (আ.) একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আদেশ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালাকে খুশি করার জন্য হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) আপন পুত্রকে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা ইব্‌রাহিম (আ)-কে কাবাঘরের স্থানটি দেখিয়ে তা পুনর্নির্মাণের আদেশ দিলেন। ইব্‌রাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে পবিত্র কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন। তারপর এ দোয়া করেন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১২৭)

এরপর আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম (আ.) মানুষকে হজের জন্য আহবান করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

অর্থ : "এবং আপনি মানুষের নিকট হজের ঘোষণা করে দিন, তারা আপনার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ২৭)

হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর আহ্বানে কাবা শরিফ আবার তাওহিদপন্থীদের পুণ্যভূমিতে পরিণত হলো। হযরত ইব্রাহিম (আ.) চলে গেলেন আপন কর্মক্ষেত্রে। আর হযরত ইসমাঈল (আ.) রয়ে গেলেন মক্কায়। পরবর্তীকালে তিনিও নবি হলেন। মৃত্যুর সময় কাবার দায়িত্বভার অর্পণ করে গেলেন আপন বংশধরের ওপর। কালক্রমে তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মূর্তিপূজা শুরু করল। কাবাগৃহে তারা স্থাপন করল ৩৬০টি মূর্তি। হজের সময় ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রথাগুলো পালিত হতো তবে তারা পূজা-অর্চনা করত প্রতিমার সামনে।

উত্তরাধিকার সূত্রে কুরাইশ বংশ তখনো কাবার রক্ষক এবং হজের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। ফলে দেশ-বিদেশে ছিল তাদের যথেষ্ট সম্মান। এ বংশেই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। বাল্যকাল থেকে তিনি মূর্তিপূজাকে অপছন্দ করতেন। মক্কায় অতি অল্পসংখ্যক লোক তখনো মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতেন। তাঁদের বলা হতো হানিফ বা একনিষ্ঠ। তাঁরা মূর্তিপূজা না করে ইব্রাহিমি হজ পালন করতেন। মক্কা বিজয়ের পর নবি করিম (স.) পুনরায় ইব্রাহিমি হজ চালু করেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হজের ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

হজের তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ পঞ্চম। সারাবিশ্বের মুসলিম জাতির মহাসম্মেলন। বিশ্বের সকল মুসলিম যে এক উম্মত, হজ মৌসুমে মক্কায় এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানগণ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মক্কায় একত্র হয়। সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠান পালন করে। সকলের ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, কর্মসূচিও এক। সকলের পরিধানে একই ধরনের সাদা পোশাক। ভাষা, বর্ণ, জীবন পদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা সকলে একই ধ্বনি উচ্চারণে একাকার হয়ে যায়। সকলের হৃদয়ে এক আল্লাহর নাম। এতে পৃথিবীর সব দেশের লোকের পরস্পর মিলনের সুযোগ হয়। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ হয়। এভাবে হজ সারাবিশ্বের মুসলমানকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। প্রতি বছর হাজিদের হজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের ফলে মুসলিম জাহানের প্রত্যেক অঞ্চলে মুসলমানের প্রাণে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইসলামের প্রাণচাঞ্চল্য পরিবেশ বজায় রাখার জন্য হজের যে এক বিরাট অবদান আছে এর মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়।

হজের ফজিলত

ইসলামে প্রত্যেকটি ইবাদতেরই যথেষ্ট গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। হজেরও অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। হজের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেনঃ

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ اُمُّهٗ-

অর্থ : "যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারতে এসে কোনো অশ্লীল কাজ করল না, আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কাজে লিপ্ত হলো না, সে গুনাহ বা পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে ফিরল যেমন সে পবিত্র ছিল সেদিন, যেদিন সে তার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল।" (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেন, "তোমরা হজ ও উমরাহ্ পর পর করতে থাক। কারণ এ দুইটি ইবাদত দারিদ্র্য, অভাব এবং গুনাহগুলোকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন আগুনের ভাটি লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূরীভূত করে তা বিশুদ্ধ করে দেয়। হজে মাবরুরের (মাকবুল) প্রতিদান হচ্ছে একমাত্র জান্নাত" (নাসাঈ)। যে মুসলমানদের ওপর হজ ফরজ তাদের উচিত খুশি মনে হজ পালন করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে হজের ফজিলত ও তাৎপর্যের ওপর আলোচনা করবে।

পাঠ ৬

হজের ফরজসমূহ (فَرَائِضُ الْحَجِّ)

হজের ফরজ তিনটি

১. হজের নিয়তে ইহ্রাম বাঁধা।

২. আরাফার ময়দানে ৯ই যিলহজ তারিখে অবস্থান (ওকূফ) করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

হজের ওয়াজিবসমূহ (وَاجِبَاتُ الْحَجِّ)

হজের ওয়াজিব কাজ পাঁচটি

১. আরাফার ময়দান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা।

২. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানো বা সাঈ করা।

৩. শয়তানকে (জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করা।

৪. তাওয়াফে বিদা অর্থাৎ মক্কার বাইরে থেকে আগত হাজিদের জন্য বিদায়কালীন তাওয়াফ করা। একে তাওয়াফুল বিদা (বিদায়ী তাওয়াফও) বলে।

৫. মাথা মুড়ানো বা চুল ছাঁটা।

হজের সুন্নাতসমূহ (سُنَنُ الْحَجِّ)

হজের অনেক সুন্নাত রয়েছে। নিচে কয়েকটি সুন্নাত উল্লেখ করা হলো :

১. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা।

২. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা।

৩. যিলহজ মাসের ৭ তারিখে ইমামের মক্কায় হজ সম্পর্কে খুতবা প্রদান করা। ৯ তারিখে আরাফায় দ্বিপ্রহরের পর খুতবা প্রদান করা। একাদশ তারিখে মিনায় খুতবা দেওয়া।

৪. ৮ই যিলহজে মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা, মিনায় উপস্থিত হয়ে যোহর থেকে ৯ই যিলহজের ফজর পর্যন্ত অবস্থান করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা।

৫. ৯ই যিলহজে সূর্য ওঠার পর মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা করা।

৬. সম্ভব হলে আরাফাতে গোসল করা।

৭. ইহ্‌রাম বাঁধার আগে গোসল করা।

৮. মুয্‌দালিফায় রাত কাটানোর পর ফজরের নামায আদায় করে সূর্য উদয়ের পূর্বে মিনার দিকে রওয়ানা করা।

৯. যিলহজ মাসের ১১, ১২ তারিখে কংকর নিক্ষেপ (রামি) এর জন্য মিনাতে রাতযাপন করা।

১০. যিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ক্রমধারা ঠিক রেখে কংকর নিক্ষেপ করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হজের ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নাতগুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭

হজ পালনের নিয়ম

ইসলামের প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়। হজ আদায়েরও নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। নিম্নে হজ পালনের নিয়মাবলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

ইহ্‌রাম : ইহরাম আরবি শব্দ। এর অর্থ নিষিদ্ধ। নামাযের উদ্দেশ্যে যেমন তাহরিমা বাঁধতে হয়, হজের জন্যও তেমনি ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। এটি হজের আনুষ্ঠানিক নিয়ত। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ থেকে যিলহজ মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত যেকোনো দিন ইহ্‌রাম বাঁধা যায়। এ সময় ছাড়া অন্য সময় ইহ্‌রাম বাঁধলে হবে না। এ সময় ইহ্‌রামের পোশাক পরবে ও কিবলামুখী হয়ে সরবে তালবিয়া পাঠ করবে। হজ মৌসুম ছাড়া অন্য সময় যদি কেউ কাবাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের ইচ্ছা করে তবে তাকেও হজের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থানে (মিকাতে) পৌঁছে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে।

তাওয়াফে কুদুম (আগমনি তাওয়াফ)

ইহ্রাম বাঁধার পর মক্কা পৌঁছে কাবাঘরের চারধারে তাওয়াফ করতে হয়। অর্থাৎ সাতবার ঘুরতে হয়। মক্কা শরিফ পৌছার পর এটি প্রথম তাওয়াফ। এ কারণে একে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনি তাওয়াফ বলা হয়। হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করতে হয়।

সাঈ : আগমনি তাওয়াফ শেষ করে কাবাঘরের অনতিদূরে অবস্থিত সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝের পথটি সাতবার অতিক্রম করতে হয়। একে বলা হয় সাঈ। সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে শেষ করতে হয়।

তারপর ইহ্রাম অবস্থায় যিলহজ মাসের সাত তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ সময়ের মধ্যে যতবার ইচ্ছা তাওয়াফ করা যায় এগুলো নফল তাওয়াফ। সাঈ করার প্রয়োজন নেই। নফল তাওয়াফে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

৭ই যিলহজ

এ তারিখে যোহর নামাযের পর ইমাম খুত্বা দেন। এ খুত্বায় তিনি হজ সম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ করে ৮ তারিখ মিনায় এবং ৯ তারিখ আরাফাতে করণীয় বা আহ্কাম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেন।

৮ই যিলহজ

এ তারিখে হাজিগণ সূর্যোদয়ের পর মিনায় আসেন। সুন্নাত অনুযায়ী গোসল করেও ইহরামের চাদর পরে 'মসজিদুলহারাম' বা বাইতুল্লাহ্ শরিফে আসেন। ইহরাম ও নিয়তের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনায় যেতে হয়। সেখানে পরের দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সুন্নাত।

৯ই যিলহজ

নবম তারিখ আরাফার দিবস। এদিন সকালেই 'আরাফায় অবস্থানের' উদ্দেশ্যে মিনায় ফজরের নামায আদায় করে আরাফার ময়দানের দিকে রওয়ানা করতে হয়। এখানে ইমামের পেছনে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসর উভয় নামায একসঙ্গে আদায় করতে হয়। নামাযের পূর্বে ইমাম খুত্বা দেন। খুতবায় হজের বাকি বিধিবিধান বর্ণনা করেন। আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের একটি ফরজ কাজ। ৯ তারিখ অথবা অনিবার্য কারণে ৯ তারিখের রাত পরবর্তী সুবহি সাদিকের পূর্বে কোনো সময়ে এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফার মাঠে অবস্থান করতে হয়। অন্যথায় হজ হবে না। এদিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে আরাফার মাঠ থেকে মুযদালিফায় ফিরে আসতে হয়। মুযদালিফায় পৌঁছে এশার নামাযের সময়ে মাগরিব ও এশা এক সঙ্গে আদায় করতে হয়। এ রাত মুযদালিফায় কাটাতে হয়।

১০ই যিলহজ

দশম দিন কুরবানির দিন। এদিন সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে হাজিগণ মিনার পথে রওয়ানা হয়। মিনার এক স্থানে শয়তানের প্রতিকৃতি হিসেবে পরপর তিনটি পাকা স্তম্ভ আছে। সেখানে পৌঁছে এদিন বড় শয়তানের প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। কংকরগুলো ছোলা পরিমাণ বড় হতে হয়। হযরত ইব্রাহিম (আ.) যখন আল্লাহর ইঙ্গিতে প্রাণপ্রিয় একমাত্র পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে যাচ্ছিলেন,

তখন শয়তান পিতা-পুত্রের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। তাঁরা বিরক্ত হয়ে শয়তানের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও নিষ্ঠার প্রতি সম্মান দেখিয়ে হাজিগণ এ পাথর নিক্ষেপ করে থাকেন।

কংকর নিক্ষেপের পর এ মিনাতেই কুরবানি করতে হয়। কুরবানির পর হাজিগণ মাথা কামিয়ে ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হন। চুল ছোট করলেও চলে, তবে সমস্ত মাথার চুল সমপরিমাপে কাটতে হয়। মেয়েদেরকে চুলের অগ্রভাগের কিছুটা কাটলেই চলে। তারপর ঐ তারিখেই অথবা ১১ কিংবা ১২ তারিখে মক্কা ফিরে কাবাঘর তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। এটি হজের একটি ফরজ কাজ।

মক্কায় প্রথম প্রবেশের সময় যদি সাফা ও মারওয়ায় সাঈ না করে থাকে তবে এ তাওয়াফের পর সাঈ করতে হয়। আগে করে থাকলে আর প্রয়োজন হয় না। তারপর মিনায় ফিরে যেতে হয় এবং সেখানেই ১১ ও ১২ তারিখ থাকতে হয়।

১১ ও ১২ তারিখ দুপুরের পর মিনার তিনটি স্তম্ভের প্রতিটিতে সাতটি করে কংকর মারতে হয়। তারপর ইচ্ছে করলে ১২ তারিখেই মক্কায় ফিরে আসতে পারেন। যদি কেউ মিনায় থেকে যান তবে তাঁকে ১৩ তারিখ দুপুরের পর তিনটি স্তম্ভে পাথর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে হয়। এভাবে হজের কার্যাবলি সমাপ্ত করতে হয়। যারা বহিরাগত তাদের সর্বশেষ কাজ হচ্ছে বিদায়ী তাওয়াফ করা। একে 'তাওয়াফুল বিদা' বা প্রত্যাবর্তনকালীন তাওয়াফও বলে। বহিরাগতদের জন্য এ তাওয়াফ ওয়াজিব।

হজের ত্রুটি ও তা সংশোধনের উপায়

হজ পালনকালে অনিচ্ছায়ও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি বা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। এই ত্রুটির কোনোটি গুরুতর আবার কোনোটি সাধারণ পর্যায়ের হয়ে থাকে। হজের ওয়াজিব পালনে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ঘটলে 'দম' ওয়াজিব হয়। যেমন : মাথা মুণ্ডনের পূর্বে শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করা। আর 'দম' হচ্ছে একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা কুরবানি করা। উট, গরু বা মহিষের এক-সপ্তমাংশও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। সাধারণভাবে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো বা হারাম শরিফ এলাকায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করলে প্রতিকার স্বরূপ 'দম' বা কুরবানি করতে হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদাকা দিতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হজ পালনের ধারাবাহিক নিয়মগুলো সংক্ষিপ্ত শিরোনামে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা

হজ একান্তই ব্যক্তিগত ইবাদত। আল্লাহর প্রেমিক হাজিগণ আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভের জন্য হজ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মুসলিম সম্প্রদায় হজের মৌসুমে বিশেষভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা হজে যান তাঁদের মন ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত থাকে, অনুরূপভাবে যাঁরা তাঁদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আসে, তাঁদের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনাশক্তি জাগ্রত হয়। হাজিগণ যে স্থান দিয়ে গমন করেন, তাঁদের 'লাব্বাইক' ধ্বনি শুনে সেখানকার অনেক মানুষের মনও হজের প্রতি আগ্রহী হয়।

বিভিন্ন দেশ হতে আগত হাজিদের শারীরিক অবকাঠামো, ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন কিন্তু মিকাতের (ইহরাম বাঁধার স্থান) কাছে এসে একই ধরনের কাপড় পরিধান করে। সবার মুখে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। মক্কা ও মদিনায় একত্র হয়ে একই ইমামের পেছনে নামায আদায় করে। সমবেত মুসলিম জনতা ভাষা, জাতি, দেশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য ভেঙে দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের বিরাট সুযোগ পায়। মানুষের মনে সাম্যের ধারণা জন্মায়। হজের এই মহাসম্মেলনে পৃথিবীর সব শ্রেণির মানুষই এসে সমবেত হয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আদান-প্রদান ঘটে। ভাব বিনিময় হয়। বিশ্বশান্তি স্থাপনে এবং জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ মিটিয়ে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের বিশেষ সুযোগ পায়। হজের এ শিক্ষা মানবসমাজে বাস্তবায়িত হলে, মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, হানাহানি, মারামারি দূর হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে।

কাজ : 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠতে হজের সামাজিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে। শিক্ষক মহোদয় বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন।

পাঠ ৮

কুরবানি (اَلْاُضْحِيَّةُ)

কুরবানির ধারণা

কুরবানির সমার্থক শব্দ 'উযহিয়্যাহ্'। এর আভিধানিক অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় যিলহজ মাসের ১০ তারিখ সকাল থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে পশু জবাই করা হয় তাকে কুরবানি বলে।

বর্তমানে যে কুরবানি প্রথা প্রচলিত আছে, তা হযরত ইব্‌রাহিম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে। এটি আত্মত্যাগ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অন্যতম মাধ্যম। এটি একটি উত্তম ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: "কুরবানির দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় কাজ আল্লাহর নিকট আর কিছুই নেই। ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুরবানির পশুর শিং, ক্ষুর ও লোমসমূহ নিয়ে হাজির হবে। কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানির দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র কর।" (তিরমিজি)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন : "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" (ইবনে মাজাহ)

কুরবানির পটভূমি

হযরত ইব্‌রাহিম (আ.)-কে আল্লাহ্ তায়ালা বহুবার বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন। সকল পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবার তিনি এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করতে আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছেন। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান ইসমাঈল অপেক্ষা দুনিয়াতে অধিকতর প্রিয় আর কী হতে পারে? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, আল্লাহ যাতে

খুশি হন তাই তিনি করবেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, তখন তিনি পুত্র ইসমাঈলকে বললেন, "তিনি (ইব্রাহিম) বললেন : হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কী? তিনি (ইসমাঈল) বললেন : হে আমার আব্বা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" (আস্-সাফ্‌ফাতঃ ১০২)

ছেলের এ সাহসিকতাপূর্ণ উত্তর পেয়ে নবি ইব্রাহিম (আ.) খুশি হলেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি পুত্র ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালালেন। এবারের পরীক্ষাতেও ইব্রাহিম (আ.) উত্তীর্ণ হলেন। পবিত্র কুরআনে আছেঃ

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ

অর্থঃ "তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললামঃ হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে।" (সুরা আস্-সাফ্‌ফাত, আয়াত ১০৪-১০৫)

আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে বেহেশত থেকে একটি দুম্বা এনে ইসমাঈলের জায়গায় ছুরির নিচে শুইয়ে দিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) এর পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। এ অপূর্ব ত্যাগের ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তখন হতেই কুরবানি প্রথা চালু হয়েছে। এটি আজ মুসলিম সমাজে একটি পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানরূপে স্বীকৃত।

কুরবানির নিয়মাবলি ও বিধিবিধান

কুরবানির কতিপয় বিশেষ নিয়মাবলি ও বিধিবিধান নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. যিলহজ মাসের ১০ তারিখ ফজর হতে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক (সাহিবে নিসাব) হয়, তবে তার ওপর কুরবানি ওয়াজিব। মুসাফিরের ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয়।

২. যিলহজ মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখ পর্যন্ত তিন দিন কুরবানির সময়। এ তিন দিনের যেকোনো দিন কুরবানি করা যায়। তবে প্রথম দিন কুরবানি করা উত্তম।

৩. ঈদুল আযহার নামাযের আগে কুরবানি করা সঠিক নয়। নামায আদায়ের পর কুরবানি করতে হয়।

৪. সুস্থ সবল ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু দ্বারা কুরবানি করতে হয়। গরু, মহিষ এবং উটে এক হতে সাত জন পর্যন্ত শরিক হয়ে কুরবানি করা যায়।

৫. কুরবানির ছাগলের বয়স কমপক্ষে এক বছর হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে দুই বছরের হতে হবে। উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর হতে হবে। দুম্বা ও ভেড়ার বয়স ছাগলের মতো। তবে ছয় মাসের বেশি বয়সের দুম্বার বাচ্চা যদি এরূপ মোটাতাজা হয় যে, এক বছরের অনেকগুলো দুম্বার মধ্যে ছেড়ে দিলে চেনা যায় না, তবে সেরূপ বাচ্চা দিয়ে কুরবানি জায়েয। কিন্তু ছাগলের বাচ্চার এক বছর বয়স না হলে কুরবানি জায়েয হবে না।

৬. কুরবানির গোশত সাধারণত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরিব মিসকিনকে, একভাগ আত্মীয় স্বজনকে দিতে হয় এবং একভাগ নিজের জন্য রাখা উত্তম।

৭. নিজ হাতে কুরবানি করা উত্তম।

৮. কুরবানির প্রাণী দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে কিবলামুখী করে, ধারালো অস্ত্র দ্বারা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করতে হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরবানির সময় একাগ্রতার সাথে উত্তম পশু কুরবানি করা। তাতে তাঁরা অনেক সাওয়াব পাবে। পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা বাড়বে এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে কুরবানির পটভূমি ও নিয়মাবলি আলোচনা করবে।

পাঠ ৯

আকিকা (اَلْعَقِيْقَةُ)

আকিকার ধারণা

'আকিকা' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভাঙা, কেটে ফেলা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনে তার কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর নামে কোনো হালাল গৃহপালিত পশু জবাই করাকে আকিকা বলা হয়।

আকিকা করা সুন্নাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। সন্তানের বিপদাপদ দূর হয়। কাজেই প্রত্যেক পিতামাতার উচিত নবজাত সন্তানের নামে যথাসময়ে আকিকা করা। হাদিসে আছে, "প্রতিটি নবজাত সন্তান আকিকার সাথে সম্পৃক্ত। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু জবাই করতে হবে। তার নাম রাখা হবে, তার মাথার চুল মুণ্ডন করা হবে।" (নাসায়ি)

নবি করিম (স.)-এর আগেও আকিকার প্রচলন ছিল। আল্লাহ তায়ালার অনুমতিতে তিনি তা চালু রাখেন। মহানবি (স.) নিজে আকিকা করেছেন, অন্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। পিতামাতা আকিকা না করলে নিজের আকিকা নিজেও করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) নবি হওয়ার পর নিজের আকিকা নিজেই করেছিলেন। আকিকা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে করা মুস্তাহাব। সপ্তম দিনে না পারলে ১৪, ২১ তারিখে অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত সপ্তম দিনেও করা যায়। মাতাপিতার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সন্তান। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করা উত্তম।

ক. সন্তানের ইসলামি নাম রাখা।

খ. মাথা মুণ্ডন করা।

গ. মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রুপা দান করা।

ঘ. আকিকা করা।

আকিকা আদায়ের নিয়ম

মুসলমানের প্রত্যেকটি বৈধ কাজই ইবাদত। ইবাদত আদায়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আর নিয়মমতো কাজটি সমাধা করলে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। তাই আকিকা করাও একটি ইবাদত এবং তা আদায়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন : "ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবাই করাই যথেষ্ট।" (নাসায়ি)।

আকিকার জন্য ছেলে হলে দুটি আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা ভেড়া জবাই করতে হয় কিংবা কুরবানির গরুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই আর মেয়ের জন্য এক অংশ নেওয়া যায়।

যে সকল পশু দ্বারা কুরবানি করা যায় ঐ সকল পশু দ্বারা আকিকাও চলে। আকিকার পশুর বয়স কুরবানির পশুর বয়সের অনুরূপ হতে হবে।

আকিকার পশুর গোশত কুরবানির পশুর গোশতের ন্যায় তিন ভাগ করে একই নিয়মে বণ্টন করতে হয়। এ গোশত সন্তানের পিতামাতা, ভাইবোন সকলেই খেতে পারে। এ গোশত রান্না করে আত্মীয় স্বজন ও গরিব মিসকিনকে খাওয়ানো যায়। চামড়া গরিব-মিসকিনকে দান করে দিতে হয়।

আকিকার পশু সন্তানের পিতার নিজ হাতে জবাই করা উত্তম। নিজে অপারগ হলে অন্যের সাহায্যে জবাই করানো যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আকিকা আদায়ের নিয়মাবলি নিয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ ১০

কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা

কুরবানি বলতে শুধু গরু, ছাগল, মহিষ, দুম্বা ইত্যাদি জবাই করা বোঝায় না। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন বোঝায়। কুরবানি আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর অতুলনীয় ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ ঘোষণা করেন যে, তাদের কাছে নিজ জানমাল অপেক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল্য অনেক বেশি। তারা পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে এর রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহর কাছে শপথ করে বলে, "হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেভাবে পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজনে আমাদের শরীরের রক্ত প্রবাহিত করতেও কুণ্ঠিত হব না।" কে কত টাকা খরচ করে পশু ক্রয় করেছে, কার পশু কত মোটা তাজা, কত সুন্দর আল্লাহ তা দেখতে চান না। তিনি দেখতে চান কার অন্তরে কতটুকু আল্লাহর ভালোবাসা ও তাকওয়া আছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

অর্থঃ "কখনো আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না এগুলোর গোশত এবং রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৩৭)

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত ইব্‌রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)। মানুষের জীবনে এ শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা হয়ে উঠবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরোপকারী ও আত্মত্যাগী। আত্মত্যাগী মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। নিজের সুখ শান্তির বাইরে যারা সমাজের মানুষের সুখকে বড় করে দেখে, তারাই প্রকৃত মানুষ। কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা আমাদেরকে পরোপকারে উৎসাহিত করবে ও মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটাবে।

কাজ : 'কুরবানির শিক্ষা মানুষকে আত্মত্যাগী ও পরোপকারী হতে সাহায্য করে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে। শিক্ষক মহোদয় বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত ——।

২. যাকাতের মাসারিফ ——টি।

৩. ইসলামের ——স্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম।

৪. হজের অনেক ——রয়েছে।

৫. ইহরাম ——শব্দ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ৯ই যিলহজ	কুরবানির দিবস
২. ১০ই যিলহজ	আরাফার দিবস
৩. আকিকা করা	উত্তম
৪. সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করা	মুস্তাহাব
৫. আকিকা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে করা	সুন্নাত

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যাকাতের সংক্ষিপ্ত ধারণা বর্ণনা কর?

২. হজের ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?

৩. যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তগুলো কী কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যাকাতের ধর্মীয় ও নৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২. সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৩. বাস্তব জীবনে আত্মত্যাগী হতে কুরবানির শিক্ষা বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'হজ' শব্দের অর্থ কী ?

ক. সংকল্প করা
খ. যিয়ারত করা
গ. তাওয়াফ করা
ঘ. সাঈ করা।

২. হজ ও উমরাহ্ পর পর করার মাধ্যমে দূরীভূত হয় –

i. দারিদ্র্য

ii. অভাব

iii. পাপ

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. হজের ফরজ কয়টি?

ক. তিন খ. চার

গ. পাঁচ ঘ. দশ।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ফরহাদ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রতি রমযান মাসে সম্পদের হিসাব করেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করেন।

৪. ফরহাদ সাহেবের কাজের মাধ্যমে শরিয়তের কোন বিধানটি আদায় হয়েছে?

ক. মুস্তাহাব খ. সুন্নাত

গ. ওয়াজিব ঘ. ফরজ।

৫. ফরহাদ সাহেবের মানসিকতার ফলে তিনি পরকালে কী পাবেন?

ক. পুরস্কার খ. নিরাপত্তা

গ. তিরস্কার ঘ. অধিকার।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নেছার সাহেব ব্যবসা করে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তিনি দুই-এক বছর পরপরই হজ্জব্রত পালন করেন। কিন্তু তিনি তার গরিব ভাই-বোন ও সমাজের দরিদ্র-অসহায় লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখেন না। এ নিয়ে সমাজে চলছে নানা ধরনের কথাবার্তা। এসব কথাবার্তা তাঁর চাচা আব্দুল করিমের কানে এলে, তিনি নেছারকে বললেন, 'সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য ভুলে গিয়ে সবার প্রতি সদয় হও।'

ক. 'ইহরাম' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'বায়তুল্লাহর হজ আল্লাহর প্রাপ্য।' বুঝিয়ে লিখো।

গ. নেছার সাহেবের কার্যক্রমে কার আদেশ যথাযথভাবে পালন হয় নি– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আব্দুল করিম সাহেবের মানসিকতা হজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন কর।

২. ফারাবি সাহেব একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গার প্রয়োজন হলো। সবাই মিলে একটি চমৎকার জায়গা নির্বাচন করল। জায়গাটি ফারাবি সাহেবের ফসল উৎপাদনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সবাই মিলে অনুরোধ করায় তিনি তা মসজিদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে দিতে সম্মত হন। তার এ কাজে তার বড় ভাই ফাহাদ সাহেব অসন্তুষ্ট হন এবং উক্ত জায়গা দিতে প্রচণ্ডভাবে বাধা প্রদান করেন।

ক. যিলহজ মাসের কোন তারিখে আরাফায় অবস্থান করতে হয়?

খ. 'তাওয়াফে কুদুম' বলতে কী বোঝায়?

গ. ফারাবি সাহেবের কাজের মাধ্যমে ইবাদতের কোন শিক্ষাটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফাহাদ সাহেবের কার্যক্রম হযরত ইবরাহিম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ঘটনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়
কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি মূলত এ উৎসদ্বয় থেকেই গৃহীত। কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফে মানব জীবনের সকল সমস্যার মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব মূলনীতির আলোকেই ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের নীতিমালার বাইরে কোনো কিছু ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ অধ্যায়ে আমরা আল-কুরআন ও হাদিসের কতিপয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আল-কুরআনের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- তাজবিদের নুন সাকিন ও তানবিন, মীম সাকিনের নিয়ম বর্ণনা করতে পারব।
- বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতে আগ্রহী হব ও পাঠ করতে পারব।
- নির্বাচিত পাঁচটি সূরার পটভূমি (শানে নুযুল) বর্ণনা করতে পারব।
- নাযিরা তিলাওয়াতের আদব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআনের সূরা আল-কাদর, আল-যিলযাল, আল-ফিল, কুরাইশ এবং আন-নাস্‌র অর্থসহ মুখস্থ বলতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আয়াতুল কুরসি ও সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখস্থ বলতে এবং অর্থ লিখতে পারব।
- নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মোনাজাতমূলক তিনটি হাদিস অর্থসহ বর্ণনা করতে পারব।
- নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী সামাজিক ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ ১
কুরআন মজিদ

পরিচয়

কুরআন শব্দটি আরবি। এটি কারউন (قَرْءٌ) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। কারউন অর্থ পড়া বা পাঠ করা। অতএব, কুরআন শব্দের অর্থ হলো পঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব। প্রত্যেক দিনই লক্ষ-কোটি মুসলমান এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এ গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সূরা ও আয়াত পাঠ করে থাকি। এ জন্য এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে আল-কুরআন।

ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর যে কিতাব নাজিল করেছেন তাকেই আল-কুরআন বলা হয়। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। সর্বকালের সকল মানুষের জন্য এ কিতাব হিদায়াতের উৎস।

আল-কুরআন 'লাওহে মাহফুযে' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। এটি প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানের 'বায়তুল ইয্যাহ' নামক স্থানে এক সাথে নাজিল করা হয়। এরপর সেখান থেকে আল-কুরআন আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর ওপর নাজিল করা হয়। মহানবি (স.)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে সর্বপ্রথম সূরা আলাকের ৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে নাজিল করা হয়। এভাবে ২৩ বছরে খণ্ড খণ্ড আকারে পুরো কুরআন নাজিল হয়।

আল-কুরআনের সূরাসমূহ দুইভাগে বিভক্ত। যথা- মক্কি ও মাদানি। মহানবি (স.) আল্লাহর নির্দেশে নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। নবি করিম (স.)-এর এ হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া সূরাসমূহ মক্কি সূরা হিসেবে পরিচিত। এ সূরাসমূহে সাধারণত আকাইদ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ, কিয়ামত ইত্যাদি হলো মক্কি সূরাগুলোর বিষয়বস্তু। অন্যদিকে মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাজিলকৃত সূরাসমূহকে মাদানি সূরা বলা হয়। এ সূরাসমূহে সালাত, যাকাত, সাওম, হজ, জিহাদ, হালাল-হারাম, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনের বেশ কিছু নাম রয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে এ নামসমূহ রাখা হয়েছে। এগুলো আল-কুরআনের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। নিম্নে এর কতিপয় নাম উল্লেখ করা হলো-

ক. **আল-ফুরকান (পার্থক্যকারী) :** আল-কুরআন সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী। এ জন্য একে আল-ফুরকান বলা হয়।

খ. **আল-হুদা (হিদায়াত, পথপ্রদর্শন) :** কুরআন মজিদের মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয় বলে একে আল-হুদা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

গ. **আর রাহমাহ (রহমত, দয়া, করুণা) :** পবিত্র কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুণাস্বরূপ। তাই একে রাহমাহ বলা হয়েছে।

ঘ. **আয-যিকর (উপদেশ, আলোচনা) :** কুরআন মজিদে বহু ঘটনার আলোচনা ও বহু উপদেশ রয়েছে। তাই একে যিকর নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঙ. **আন-নুর (জ্যোতি, আলো) :** পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে হালাল-হারামের রহস্য উদ্ভাসিত হয়, তাই একে 'নুর' বলা হয়।

কুরআন মজিদ ৩০টি (ত্রিশটি) ভাগে বিভক্ত। এর প্রতিটি ভাগকে এক একটি পারা বলা হয়। এর সূরা সংখ্যা মোট ১১৪টি। এগুলোর মধ্যে ৮৬টি সূরা মক্কি এবং ২৮টি সূরা মাদানি। আল-কুরআনে সর্বমোট ৭টি মনজিল, ৫৫৮টি রুকু ও ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ৬২৩৬টি, মতান্তরে ৬৬৬৬টি।

আল-কুরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল-কুরআন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহাগ্রন্থ। আল-কুরআন আমাদের আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দান করে। আমরা আল্লাহ তায়ালাকে চিনতাম না। তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলি সম্পর্কে জানতাম না। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর ওপর কুরআন মজিদ নাজিল করেন। মহানবি (স.) আমাদের আল-কুরআন শিক্ষা দেন। ফলে আমরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করি। তাঁর আদেশ-নিষেধ জানতে পারি। কী কাজ করলে তিনি খুশি হন আর কোন কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা-ও জানতে পারি। আল-কুরআন না থাকলে এগুলো সম্ভব হতো না। অতএব বোঝা গেল যে, মানব জীবনে আল-কুরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়াতের প্রধান উৎস। কোন পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে আল-কুরআন তা আমাদের দেখিয়ে দেয়। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদির পরিচয় দান করে। আল-কুরআনের নির্দেশনামতো চলে আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারি। আখিরাতে আল-কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল-কুরআনের নির্দেশ মেনে চলবে সে হবে মহাসৌভাগ্যশালী। সে পাবে চিরশান্তির জান্নাত। আর যে কুরআন মজিদের আদেশ নিষেধ মানবে না তার স্থান হবে যন্ত্রণাদায়ক জাহান্নামে।

আল-কুরআন আমাদের নৈতিক ও মানবিক আদর্শ শিক্ষা দেয়। আল-কুরআন অনুসরণ করে আমরা উত্তম চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি। ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি ইত্যাদি দূরীভূত হবে।

কুরআন মজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্দিষ্ট জাতির জন্য নাজিল হয়নি। বরং এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন মহাগ্রন্থ। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলের হিদায়াতের জন্য এ কুরআন নাজিল হয়েছে।

আল-কুরআনের শিক্ষা

কুরআন মজিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এটি যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। এছাড়া মানুষের জীবনে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে তার সমাধানের ব্যাপারে এতে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : "আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেই নি।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত ৩৮)

আল-কুরআনের সকল জ্ঞান ও শিক্ষাই সুস্পষ্ট। সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য। এতে উল্লেখিত সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য, যুগোপযোগী ও যুক্তিসংগত। এ কিতাবে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি সকল প্রকার ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। আল-কুরআনের প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

অর্থ : "এটি সেই কিতাব, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২)

আল-কুরআন ইসলামি শরিয়াহ'র প্রধান উৎস। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন কেমন হবে তা এ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ কীভাবে ইবাদত করবে, কীভাবে চরিত্র গঠন করবে তাও এ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.)-এর মতে, আল-কুরআনে বহু জ্ঞানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো মোট পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা-

১. ইলমুল আহকাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান।

২. ইলমুল মুখাসামা বা বিতর্ক বিদ্যা।

৩. ইলমুত তাযকির বি আলা ইল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও নিদর্শন সম্পর্কিত জ্ঞান।

৪. ইলমুত তাযকির বি আইয়ামিল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিজগতের অবস্থা, তাঁর প্রদত্ত পুরস্কার ও শাস্তি সংক্রান্ত জ্ঞান।

৫. ইলমুত তাযকির বিল মাউত ওয়ামা বাদাল মাউত বা মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কিত জ্ঞান।

প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআন মানবজাতির মহামুক্তির সনদ। এটি মানুষকে আলোর দিকে পরিচালনা করে। শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়। সুতরাং আমরা আল-কুরআন পড়ব। এর অর্থ জানব এবং তদনুযায়ী আমল করব। আল-কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করব।

কাজ : এ পাঠ পড়ে কুরআন মজিদের শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থী যা জানতে পেরেছে তা তার পাশের বন্ধুকে বলবে।

পাঠ ২

তাজবিদ (اَلتَّجْوِيْدُ)

কুরআন মজিদ তিলাওয়াতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত। এর দ্বারা বান্দা বিরাট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। শুধু তিলাওয়াতকারীই নয় বরং তিলাওয়াতকারীর মাতাপিতাও এতে সম্মানিত হন। হাদিসে এসেছে– যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে মুকুট পরানো হবে। এ মুকুটের ঔজ্জ্বল্য সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি হবে। অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে কুরআন শেখে এবং অপরকেও শিক্ষা দেয়।" (বুখারি)

তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা নিজ পাঠকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।" (মুসলিম)

অতএব বোঝা গেল কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমল। আমরা বেশি বেশি নিয়মিত কুরআন পড়ব এবং অন্যকেও কুরআন পড়তে উৎসাহিত করব।

তাজবিদের গুরুত্ব

সহিহ শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের রীতিকে তাজবিদ বলে। আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত লাভের জন্য সহিহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে হবে। আর এ জন্য তাজবিদের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাজবিদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে পাঠকারী গুনাহগার হবে এবং তার নামায শুদ্ধ হবে না। তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ

অর্থ : "আপনি ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করুন।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত ৪)

একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "ইলমে কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতার দলভুক্ত, যারা নেককার ও আল্লাহর হুকুমে লেখার কাজে ব্যস্ত। আর যে ব্যক্তি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বারবার চেষ্টা করে কুরআন তিলাওয়াত করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।" (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং আমরা নিয়মিত তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করব। যদি কুরআন তিলাওয়াত করতে কষ্ট হয় তবুও পড়তে চেষ্টা করব। কোনো অবস্থাতেই কুরআন তিলাওয়াত ত্যাগ করব না। আর তাজবিদ শিক্ষা করব। এতে আমরা বিরাট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারব।

পাঠ ৩

নুন সাকিন ও তানবিনের বর্ণনা

নুন সাকিন : জযমযুক্ত নুনকে নুন সাকিন বলা হয়। অর্থাৎ যে নুনের ওপর জযম (ـــْـــ) থাকে তাকে নুন সাকিন বলে। যেমন- اَنْ-اِنْ-اُنْ

তানবিন : দুই যবর (ـــً), দুই যের (ـــٍ) ও দুই পেশকে (ـــٌ) তানবিন বলা হয়। তানবিনের মধ্যে একটি জযমযুক্ত নুন উহ্য অবস্থায় থাকে। উচ্চারণের সময় তা প্রকাশ পায়। যেমন- رَجُلٌ - এর উচ্চারণ হবে رَجُلُنْ-এর মতো। অর্থাৎ ل (লাম) হরফের তানবিনের বদলে ل -এর ওপর পেশ ও নুন সাকিন পড়া হয়।

নুন সাকিন ও তানবিনের হুকুম

নুন সাকিন ও তানবিনের উচ্চারণ একই রকম। এজন্য এ দুটির বর্ণনা তাজবিদশাস্ত্রে একসাথে করা হয়। তাজবিদে নুন সাকিন ও তানবিনের হুকুম চারটি। অর্থাৎ চারটি নিয়মে নুন সাকিন ও তানবিনকে পড়তে হয়।

এগুলো হলো-

১. ইদগাম (إِدْغَامٌ)

২. ইখফা (إِخْفَاءٌ)

৩. ইযহার (إِظْهَارٌ)

৪. কালব (قَلْبٌ)

নিম্নে আমরা এগুলো সম্পর্কে জানব।

ইদগাম

ইদগাম শব্দের অর্থ মিলিয়ে পড়া, এক জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে মেলানো। এক হরফকে অন্য হরফের সাথে মিলিয়ে সন্ধি করে পড়া।

তাজবিদের পরিভাষায় নুন সাকিন বা তানবিনের পর ইদগামের ছয়টি হরফ থেকে কোনো একটি হরফ থাকলে নুন সাকিন বা তানবিনের সাথে ঐ হরফকে সন্ধি করে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলা হয়।

ইদগামের ফলে উভয় হরফ একই সময়ে উচ্চারিত হয়। ইদগামের ফলে নুন সাকিন বা তানবিনের পরবর্তী হরফটি তাশদিদ (ـــّـ) যুক্ত হয়। যেমন- مَنْ رَّبُّكَ

ইদগামের হরফ মোট ছয়টি। যথা-

ي — ر- م — ل — و — ن

এগুলোকে একত্রে يَرْمُلُوْنَ বলা হয়। ইদগাম মোট দুই প্রকার। যথা :

ক. গুন্নাহসহ ইদগাম

খ. গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম

ক. গুন্নাহসহ ইদগাম : নুন সাকিন বা তানবিনের পর ي — و- م — ن এই চারটি হরফের যেকোনো একটি আসলে নুন সাকিন বা তানবিনকে ঐ হরফের সাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে গুন্নাহসহ ইদগাম বলে। এর অপর নাম ইদগামে নাকিস। যেমন- حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ -مَنْ يَّقُوْلُ এখানে نْ নুন সাকিন ও তানবিন এর পর ইয়া (ي) এবং ن (নুন) হরফ আসায় নুন সাকিন ও তানবিনকে ইয়া ও নুন এর সাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

খ. গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম : নুন সাকিন বা তানবিনের পর ر - ل (রা, লাম) এ দুটি হরফের কোনো একটি হরফ আসলে নুন সাকিন বা তানবিনকে গুন্নাহ না করে ঐ হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। একে গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম বলে। এর অন্য নাম ইদগামে কামিল। যেমন : مِنْ لَّدُنْكَ-غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ওপরের উদাহরণ দুটিতে নুন সাকিন ও তানবিনের পরে ر (রা) এবং ل (লাম) হরফ এসেছে। ফলে নুন সাকিন ও তানবিনকে এদের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। তবে এক্ষেত্রে গুন্নাহ করা যাবে না।

ব্যতিক্রম : ইদগামের নিয়মে আমরা কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাই। যেমন- صِنْوَانٌ-بُنْيَانٌ-دُنْيَا

এ শব্দসমূহে নুন সাকিনের পর ي (ইয়া) এবং و (ওয়াও) হরফ এসেছে। কিন্তু এখানে ইদগামের নিয়মে নুন সাকিনকে পরবর্তী হরফের সাথে মিলিয়ে তাশদিদসহ পড়া হয় না। এর কারণ হলো- ইদগামের উদ্দেশ্য হলো শব্দের উচ্চারণকে সহজ করা। এসব শব্দে মিলিয়ে পড়লে উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়। এজন্য এ শব্দগুলোতে ইদগাম হয় না।

ইখফা (اِخْفَاءٌ)

ইখফা অর্থ গোপন করে পড়া। ইখফার হরফ ১৫টি। যথা-

ت- ث - ج- د- ذ- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ف- ق- ك

নুন সাকিন বা তানবিনের পর ইখফার হরফ থেকে যেকোনো একটি হরফ এলে উক্ত নুন সাকিন বা তানবিনকে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করার মতো নাসিকা সংযোগে গোপন করে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে ইখফা বলে।

নুন সাকিনের মধ্যে ইখফার উদাহরণ :

مِنْ تَحْتِهَا-مُنْذِرِيْنَ-مِنْكُمْ-مِنْ سِجِّيْلٍ-مَنْ فَعَلَ-عِنْدِيْ

তানবিনের মধ্যে ইখফার উদাহরণ :

ذَرَّةٍ شَرًّا-نِعْمَةٍ تُجْزٰى-ظِلًّا ظَلِيْلًا

ইযহার (اِظْهَارٌ)

ইযহার শব্দের অর্থ স্পষ্ট করে পড়া, প্রকাশ করে দেওয়া ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় নুন সাকিন বা তানবিনের পর ইযহারের কোনো একটি হরফ আসলে ঐ নুন সাকিন বা তানবিনকে গুন্নাহ না করে স্পষ্টভাবে নিজ মাখরাজ থেকে পড়াকে ইযহার বলে।

ইযহারের হরফ মোট ছয়টি। যথা- ء ه ح خ ع غ

এ হরফগুলোকে হরফে হালকি বলা হয়।

উদাহরণ مِنْهُمْ-مِنْ خَيْرٍ-عَزِيْزٌ عَلَيْهِ

কালব বা ইকলাব قَلْبٌ বা اِقْلَابٌ

কালব বা ইকলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া। তাজবিদের পরিভাষায় নুন সাকিন বা তানবিনের পর ب (বা) হরফ আসলে ঐ নুন সাকিন বা তানবিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহসহ পড়াকে কালব বা ইকলাব বলে।

ইকলাবের হরফ মাত্র একটি। এটি হলো- ب (বা)। উদাহরণ: مِنْۢ بَعْدِ-سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

উল্লেখ্য, কুরআন মজিদে ইকলাবের অবস্থায় নুন সাকিন বা তানবিনের পাশে ছোট করে মীম হরফটি উল্লেখ থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নুন সাকিন ও তানবিনের নিয়ম চারটি লিখে একটি চার্ট তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

মীম সাকিনের বর্ণনা

মীম সাকিন : জযমযুক্ত মীম (مْ) কে মীম সাকিন বলে। অর্থাৎ মীম হরফের ওপর জযম (ـــْـــ) থাকলে তাকে মীম সাকিন বলা হয়। যেমন- لَكُمْ

মীম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি: যথা-

ক. ইযহার (اِظْهَارٌ)

খ. ইদগাম (اِدْغَامٌ)

গ. ইখফা (اِخْفَاءٌ)

ইযহার

ইযহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া। মীম সাকিনের পর ب (বা) এবং م (মীম) ছাড়া অন্য যে কোনো হরফ আসলে ঐ মীম সাকিনকে স্পষ্ট করে গুন্নাহ ব্যতীত নিজ মাখরাজ থেকে পড়াকে মীম সাকিনের ইযহার বলা হয়। যথা-

لَكُمْ دِيْنُكُمْ - اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

ইদগাম

ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। জযমযুক্ত মীম-এর পর হরকত যুক্ত মীম এলে উভয় মীমকে একসাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়াকে ইদগাম বলে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মীমের ওপর তাশদিদ যুক্ত হয়। যেমন- فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

ইখফা

ইখফা অর্থ গোপন করে পড়া। মীম সাকিনের পর ب (বা) আসলে ঐ মীম সাকিনকে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে মীম সাকিনের ইখফা বলে। যথা-

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

কাজ : মীম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি শিক্ষার্থী খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫

নাযিরা তিলাওয়াত

নাযিরা তিলাওয়াত হলো দেখে দেখে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা। নাযিরা তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের ফজিলতের বর্ণনা আমরা জেনেছি। অতএব আমরা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করব এবং এর পূর্ণ ফজিলত লাভ করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার বাণী। আল্লাহ তায়ালা যেমন মহান তেমনি তাঁর পবিত্র কালামও মহান। আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্য সব কালামের চেয়ে এত বেশি, যেমন আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টিজগতের চেয়ে বেশি। অতএব, সর্বোচ্চ সম্মান ও আদবের সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. পূর্ণরূপে ওযু করে পাক-পবিত্র স্থানে বসা।

খ. কেবলামুখী হয়ে নামাযের অবস্থার মতো বসা।

গ. তিলাওয়াতের আগে কয়েক বার দুরূদ শরিফ পড়া।

ঘ. আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে তিলাওয়াত শুরু করা।

ঙ. হিফয বা মুখস্থ করার নিয়ত না থাকলে ধীরে স্থিরে তাজবিদের সাথে তিলাওয়াত করা।

চ. সক্ষম হলে অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা।

ছ. অর্থ বুঝে না আসলে কুরআন মজিদের প্রতি ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়া।

জ. সুন্দর সুরে তিলাওয়াত করা।

ঝ. তিলাওয়াতের সময় কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা না করা।

ঞ. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিলাওয়াত করা।

ট. তিলাওয়াত শেষে খুব সম্মান ও তাযিমের সাথে কুরআন মজিদকে পবিত্র উঁচুস্থানে রেখে দেওয়া।

আমরা আদবের সাথে নিয়মিত কুরআন পড়ব। পবিত্র কুরআনের প্রতি যেন কোনোরূপ বেয়াদবী না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখব।

নাযিরা তিলাওয়াতের জন্য নির্ধারিত পাঠ-সূরা বাকারার ৯ম রুকু থেকে ১২তম রুকু ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সম্মুখে শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং বাড়িতেও শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করবে ।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআনের ৫টি সূরা

পাঠ ৬

সূরা আল-কাদর (سُوْرَةُ الْقَدْرِ)

সূরা আল-কাদর আল-কুরআনের অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন সূরা । এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয় । এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি । সূরা আল-কাদর কুরআন মজিদের ৯৭তম সূরা । এ সূরায় 'লাইলাতুল কাদর'-এর ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে । এ সূরায় লাইলাতুল কাদর শব্দটি মোট তিনবার এসেছে । এর কাদর শব্দ থেকে এ সূরার নাম রাখা হয় সূরা আল-কাদর ।

শানে নুযুল

একদা রাসুলুল্লাহ্ (স.) বনি ইসরাইলের এমন একজন লোক সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, যিনি সমস্ত রাত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং সারা দিন জিহাদ করতেন । এভাবে এক হাজার মাস যাবৎ অবিরাম আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতে মগ্ন থাকেন । এ বিবরণ শুনে সাহাবিগণ বিস্ময় প্রকাশ করলেন । অতঃপর নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আফসোস করতে লাগলেন ।

সাহাবিগণ ভাবলেন– আমরা এক হাজার মাস ইবাদত করার সুযোগ পাব না । অথচ পূর্ববর্তীগণ বহু বছর বেঁচে থাকতেন । বেশি দিন ইবাদত করার সুযোগ পেতেন । ফলে আমরা ইবাদতের সাওয়াবে কোনো দিন তাদের সমান হতে পারব না । সাহাবিগণের আফসোসের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন । এতে তিনি জানিয়ে দেন যে, লাইলাতুল কাদরের এক রাতের ইবাদত হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও উত্তম ।

শব্দার্থ

اَنْزَلْنَا	-	আমি অবতীর্ণ করেছি, নাজিল করেছি
لَيْلَةٌ	-	রাত, রজনী
اَلْقَدْرِ	-	পরিমাণ, ভাগ্য, মর্যাদা, মহিমা
لَيْلَةُ الْقَدْرِ	-	মহিমান্বিত রাত

مَا	-	কী, যা
خَيْرٌ	-	ভালো, উত্তম
اَلْفٌ	-	হাজার, সহস্র
شَهْرٌ	-	মাস
تَنَزَّلُ	-	অবতীর্ণ হয়, নাজিল হয়, অবতরণ করে
اَلْمَلٰٓئِكَةُ	-	ফেরেশতাগণ
وَالرُّوْحُ	-	আত্মা, জিবরাইল (আ.) এর অপর নাম রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা
اِذْنٌ	-	অনুমতি, অনুমোদন
حَتّٰى	-	পর্যন্ত, যতক্ষণ না
سَلَامٌ	-	শান্তি
مَطْلَعِ	-	আবির্ভাব, উদয়
اَلْفَجْرِ	-	প্রভাত, ফজরের সময়, ঊষা।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○

১. নিশ্চয়ই আমি এটি (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○

২. আর আপনি কি জানেন এ মহিমান্বিত রাতটি কী?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ○

৩. মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ○

৪. সে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাইল ফেরেশতা) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

৫. সে রাতের ঊষা উদয় হওয়া পর্যন্ত শান্তিই শান্তি (বিরাজ করে)।

ব্যাখ্যা

লাইলাতুল কাদর বা কাদরের রাত অত্যন্ত মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত রাত। আল্লাহ্ তায়ালা এ রাতেই পবিত্র কুরআন নাজিল করেন। এ রাতের ইবাদত হাজার মাস একাধারে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। এক হাজার মাস ৮৩ বছর ৪ মাসের সমান। আমাদের আয়ুষ্কাল খুবই সীমিত। এ অবস্থায় এ রাতে ইবাদত করলে আমাদের নেকির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এটি আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ। এ রাতে আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাকে রহমত, বরকত ও শান্তির সওগাত দিয়ে প্রেরণ করেন। এ রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুখ-শান্তি ও রহমত বিরাজ করতে থাকে।

শিক্ষা : এ সূরা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা পাই:

- লাইলাতুল কাদর অত্যন্ত মহিমান্বিত রাত।
- এ রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।
- এ রাতে ফেরেশতাগণ শান্তি ও কল্যাণ নিয়ে দুনিয়ায় নেমে আসেন।
- এ রাতে সারাক্ষণ শান্তি ও রহমত বর্ষিত হয়।

আমরা যথাযথভাবে লাইলাতুল কাদর উদযাপন করব। বেশি বেশি নফল ইবাদত বন্দেগি করব। এ রাতের সামান্য সময়ও আমরা ইবাদত না করে কাটাব না। তাহলে আমরা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা বেশি সাওয়াব লাভ করব। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জীবনে শান্তি ও কল্যাণ দান করুন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা এ সূরার শানে নুযুল পড়বে এবং তা তাদের খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

সূরা আল-যিলযাল (سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ)

আল-কুরআনের ৯৯তম সূরা আল-যিলযাল। এ সূরায় কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত যিলযাল শব্দ থেকে এর নাম রাখা হয়েছে সূরা আল-যিলযাল। এটি মদিনা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা আটটি।

শানে নুযুল

একদা জনৈক ব্যক্তি একজন ফকিরকে অতি অল্প পরিমাণ খাদ্য দান করে। অতঃপর সে বলল যে, এ সামান্য দানে কি সাওয়াব হবে?

অপর এক ব্যক্তি ছোট ছোট গুনাহ্ করত। এগুলো থেকে বিরত থাকত না। বরং সে এগুলোকে অবহেলা করত। আর এগুলোর কোনো গুরুত্ব দিত না।

এ দুই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। আর সকলকে জানিয়ে দেন যে, পুণ্য বা পাপ তা যত ছোটই হোক না কেন কিয়ামতে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতঃপর এগুলোর জন্যও পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

শব্দার্থ

اِذَا	-	যখন
زُلْزِلَتِ	-	কম্পিত হবে
اَلْاَرْضُ	-	জমিন, পৃথিবী, মাটি
وَاَخْرَجَتِ	-	বের করে দেবে
اَثْقَالَ	-	বোঝাসমূহ, ভরসমূহ
قَالَ	-	বলবে
يَوْمَئِذٍ	-	সেদিন
تُحَدِّثُ	-	বর্ণনা করবে, কথা বলবে
اَخْبَارَ	-	সংবাদসমূহ, খবরসমূহ
يَصْدُرُ	-	বের হবে, প্রকাশিত হবে
اَشْتَاتًا	-	ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, পৃথক পৃথকভাবে
اَعْمَالٌ	-	আমলসমূহ
مِثْقَالٌ	-	পরিমাণ
ذَرَّةٌ	-	বিন্দু, অণু, ক্ষুদ্রতম অংশ
خَيْرٌ	-	উত্তম, ভালো
شَرٌّ	-	মন্দ, খারাপ, নিকৃষ্ট
يَرَهٗ	-	সে তা দেখবে

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ○

১. যখন পৃথিবী আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ○

২. আর পৃথিবী যখন তার (অভ্যন্তরস্থ) ভারসমূহ বের করে দেবে।

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ○

৩. এবং মানুষ বলতে থাকবে এর (পৃথিবীর) কী হলো?

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ○

৪. সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝

৫. কেননা আপনার প্রতিপালক তাকে (এজন্য) আদেশ করবেন।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝

৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখানো যায়।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝

৭. কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা সে দেখবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

৮. আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে, তাও সে দেখতে পাবে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের বর্ণনা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এক সময় গোটা দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। তিনি হযরত ইসরাফিল (আ.)-কে শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার আদেশ দেবেন। হযরত ইসরাফিল (আ.)-তখন শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। তাঁর শিঙ্গার শব্দে সারা পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাবে। পৃথিবী চরমভাবে কাঁপতে থাকবে। পৃথিবীর দালানকোঠা, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা সমস্ত কিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আসমান ভেঙ্গে যাবে। ভূপৃষ্ঠ তার ভেতরের সবকিছু বের করে দেবে। কবরসমূহ থেকে মানুষ বের হয়ে আসবে। এসব কিছু দেখে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে। এরপর সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্র হবে। সেখানে তাদের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কাজকর্মও সেদিন হিসাবের বাইরে থাকবে না। বরং ছোট পাপ করলেও তার শাস্তি পেতে হবে। অন্যদিকে অণু পরিমাণ পুণ্য করলেও সেদিন মানুষ তার আমলনামায় দেখতে পাবে। এ পরিমাণ পুণ্যেরও প্রতিদান দেওয়া হবে।

শিক্ষা : এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- কিয়ামতে পৃথিবীর অবস্থা হবে ভয়াবহ। সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।
- মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে।
- হাশরের ময়দানে মানুষ নিজ নিজ আমলনামা দেখতে পাবে।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ বা পুণ্য কোনো কিছুই এ আমলনামায় বাদ পড়বে না।

আমরা সর্বদা কিয়ামত, হাশর ও আখিরাতের কথা স্মরণ রাখব। সেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে।

সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। পাপ-পুণ্য যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন সেদিন তাও আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। সুতরাং আমরা ছোট বড় কোনো পাপকে অবহেলা করব না, বরং সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থী সূরা যিলযালের চারটি শিক্ষা তার পাশের সহপাঠীকে বলবে এবং তা খাতায় লিখবে।

পাঠ ৮

সূরা আল-ফিল

সূরা ফিল আল-কুরআনের ১০৫তম সূরা। এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি। ফিল অর্থ হাতি। এ সূরায় হস্তিবাহিনীর করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা ফিল।

শানে নুযুল

আরবের ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল আবরাহা। সে ছিল খ্রিষ্টান। সে সানআ নামক স্থানে একটি সুন্দর ও বহু মণিমুক্তা খচিত গির্জা তৈরি করে। অতঃপর মানুষকে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আহ্বান করে। সে চাইল মানুষ যেন মক্কা শরিফে অবস্থিত পবিত্র কাবাগৃহ ছেড়ে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আগমন করে। কিন্তু মানুষ কাবাগৃহকে খুব সম্মান করত। সুতরাং তারা তার আহ্বানে সাড়া দিল না। তারা আগের মতোই কাবাগৃহে উপাসনা করতে লাগল। এতে আবরাহা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে চিন্তা করল- কাবাগৃহ ধ্বংস না করলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। এ জন্য সে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য মক্কা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে বহু সৈন্য সংগ্রহ করে এবং ১৩টি বিশালকায় শক্তিশালী হাতি নিয়ে অগ্রসর হয়।

আবরাহার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর দাদা ও কুরাইশদের সর্দার। তিনি জানতেন যে কাবা হলো আল্লাহর ঘর। সুতরাং এ ঘরের রক্ষার দায়িত্বও আল্লাহরই ওপর। আব্দুল মুত্তালিবের নির্দেশে কুরাইশগণ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পরদিন ভোরে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে কাবা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করলেন। এগুলো ছিল একপ্রকার ছোট পাখি। এরা দুই পায়ে দুটি এবং ঠোঁটে একটি করে কংকর নিয়ে এলো। অতঃপর এগুলো আবরাহার বাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করল। ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আর আবরাহা আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল। পরে তার ক্ষতস্থানে পচন ধরে এবং ভয়ঙ্কর কষ্টের পর সে মারা যায়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

হস্তিবাহিনীর ঘটনাটি ৫৭০ সালে সংঘটিত হয়। আমাদের প্রিয়নবি (স.) এ বছরই জন্মগ্রহণ করেন। এ অলৌকিক ঘটনা তাঁর জন্মের ৫০দিন পূর্বে ঘটেছিল। আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে এ বিশেষ ঘটনা সকলকে জানিয়ে দেন।

শব্দার্থ

اَلَمْ تَرَ	আপনি কি দেখেন নি?	اَرْسَلَ	তিনি প্রেরণ করেন।
كَيْفَ	কীভাবে, কীরূপে	طَيْرًا	পাখি
اَصْحٰبِ	সঙ্গীগণ, সাথীগণ, অধিপতি, মালিক	اَبَابِيْلَ	আবাবিল, একপ্রকার ছোট পাখি যা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে
اَلْفِيْلِ	হাতি	حِجَارَةٍ	পাথর
اَلَمْ يَجْعَلْ	তিনি কি করেন নি?	سِجِّيْلٍ	কংকর, নুড়ি পাথর
كَيْدَ	ষড়যন্ত্র, গোপন চক্রান্ত, কৌশল	عَصْفٍ	তৃণ, খড়-কুটো
تَضْلِيْلٍ	ব্যর্থতা, ব্যর্থ করে দেওয়া	مَّاْكُوْلٍ	ভক্ষিত, যা ভক্ষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ○

১. আপনি কি দেখেন নি, আপনার প্রতিপালক হস্তি বাহিনীর প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলেন?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ○

২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি ?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○

৩. আর তিনি তাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন।

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○

৪. সেগুলো তাদের ওপর কংকর জাতীয় পাথর নিক্ষেপ করে।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○

৫. অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণসদৃশ করেন।

ব্যাখ্যা

ইয়ামানের বাদশাহ আবরাহা ছিল অনেক ধনসম্পদ ও সৈন্য-সামন্তের অধিকারী। তার ছিল বিশাল হস্তিবাহিনী। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কুদরতের তুলনায় এসব ধনসম্পদ, ক্ষমতা কিছুই না। বরং আল্লাহ তায়ালা যা চান তা-ই হয়। তিনি যাকে যেভাবে ইচ্ছা লাঞ্ছিত, অপমানিত করতে পারেন।

আবরাহা গর্ব ও অহংকারবশত আল্লাহ তায়ালার সাথে শত্রুতা করে। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা ছোট ছোট পাখির সাহায্যে তার বিশাল বাহিনী ধ্বংস করে দেন। বস্তুত এটা ছিল আল্লাহর কুদরত মাত্র। আল্লাহর সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতাকারীদের তিনি এভাবেই ধ্বংস করে থাকেন।

শিক্ষা : এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- আল্লাহদ্রোহীদের আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন।
- তিনি তাদের সমস্ত কলাকৌশল ব্যর্থ করে দেন।

আমরা আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস রাখব। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। তাঁর দীনের সাথে কখনো শত্রুতা করব না।

কাজ : সূরা ফিল নাজিল হওয়ার পটভূমি সম্পর্কে শিক্ষার্থী বন্ধুকে বলবে এবং এ সূরার শিক্ষা নিয়ে তার সাথে আলোচনা করবে।

পাঠ ৯

সূরা কুরাইশ

সূরা কুরাইশ হলো মক্কি সূরা। এর আয়াত সংখ্যা চারটি। এটি আল-কুরআনের ১০৬তম সূরা। এ সূরায় মক্কা নগরীর কুরাইশদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে সূরা কুরাইশ।

শানে নুযুল

পবিত্র কাবাগৃহ মক্কা নগরীতে অবস্থিত। এ গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার দায়িত্ব ছিল কুরাইশ সম্প্রদায়ের ওপর। এজন্য কুরাইশগণ বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করত। লোকজন তাদের সম্মান করত। তাদের নেতৃত্ব মেনে চলত। তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করার সাহস পেত না। এ সুযোগে তারা সিরিয়া, ইয়ামান প্রভৃতি দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। চোর-ডাকাত, ছিনতাইকারীরা তাদের বাধা দিত না। এমনকি শীত-গ্রীষ্মের প্রতিকূল পরিবেশেও তারা সকলের সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে পারত। তাছাড়া হজ উপলক্ষে বিপুল লোকজন মক্কা নগরীতে আসত, এতে করেও কুরাইশগণ বহু অর্থ-সম্পদ লাভ করত।

কুরাইশদের এসব মানসম্মান ও ধনসম্পদ ছিল মূলত কাবা গৃহের বদৌলতে। সুতরাং তাদের উচিত ছিল এ গৃহের প্রভুকে মেনে চলা। অথচ তারা তা করত না। বরং তারা ছিল মুশরিক। তারা মূর্তিপূজা করত। আল্লাহর

একত্ববাদে বিশ্বাস করত না। রিসালাত ও আখিরাতেও তারা বিশ্বাস করত না। এমনকি রাসুলুল্লাহ (স.) যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন তখনো তারা তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল। এ জঘন্য ও অনৈতিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করে তাদের সতর্ক করে দেন।

শব্দার্থ

اِيۡلٰفِ	-	আসক্তি, অনুরাগ
قُرَيۡشٍ	-	কুরাইশ বংশীয় লোক
رِحۡلَةَ	-	ভ্রমণ, সফর
اَلشِّتَآءِ	-	শীতকাল
اَلصَّيۡفِ	-	গ্রীষ্মকাল
هٰذَا	-	এই
اَلۡبَيۡتِ	-	ঘর, বাড়ি
اَلَّذِيۡٓ	-	যিনি, যে
اَطۡعَمَ	-	আহার দিয়েছেন
هُمۡ	-	তাদের
جُوۡعٍ	-	ক্ষুধা
اٰمَنَ	-	নিরাপদ করেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন
خَوۡفٍ	-	ভয়-ভীতি

অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ○

১. যেহেতু কুরাইশের আসক্তি রয়েছে।

اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيۡفِ ○

২. আসক্তি রয়েছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।

فَلۡيَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَيۡتِ ○

৩. অতএব, তারা এ ঘরের মালিকের ইবাদত করুক।

الَّذِيۡٓ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ○

৪. যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন আর তাদের নিরাপদ করেছেন ভয়-ভীতি থেকে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় কুরাইশদের নানা নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব নিয়ামতের পরিবর্তে তাদের কী করা উচিত এ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মক্কা নগরীতে কাবা গৃহ অবস্থিত। কাবা হলো আল্লাহর ঘর। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা মক্কার কুরাইশদের নানা সুবিধা প্রদান করেন। তিনি তাদের সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা দান করেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় খাদ্য, পানীয় দান করেন। সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো এসব নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করা। যে ঘরের বদৌলতে তারা এসব লাভ করলো সে ঘরের মালিকের ইবাদত করা। কেননা তিনিই তাদের এসব দান করেছেন।

শিক্ষা : এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- আল্লাহ তায়ালা আমাদের খাদ্য-পানীয় ও নিরাপত্তা দান করেন।
- তিনি সকল নিয়ামতের মালিক।
- সকলেরই উচিত তাঁর ইবাদত করা।

অতএব, আমরা সবসময় আল্লাহর ইবাদত করব। তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য তাঁর শোকরিয়া আদায় করব। তাহলে তিনি আমাদের প্রতি নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেবেন।

কাজ : সূরা কুরাইশের তিনটি শিক্ষা শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে ও শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০

সূরা আন-নাস্‌র (سُوْرَةُ النَّصْرِ)

সূরা আন-নাস্‌র পবিত্র কুরআনের একটি সূরা। এই সূরা মক্কায় বিদায় হজের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু যে সমস্ত সূরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো স্থান নির্বিশেষে মাদানী সূরা। এজন্য এ সূরাও মাদানী সূরা। এর আয়াত সংখ্যা তিন। সূরা আন-নাস্‌র পবিত্র কুরআনের ১১০তম সূরা। এ সূরার 'নাস্‌র' শব্দ থেকে সূরাটির নাম রাখা হয়েছে আন-নাস্‌র।

শব্দার্থ

اِذَا	-	যখন
جَآءَ	-	আসবে
نَصْرُ اللّٰهِ	-	আল্লাহর সাহায্য
وَ	-	এবং, ও
اَلْفَتْحُ	-	বিজয়
رَاَيْتَ	-	আপনি দেখবেন
اَلنَّاسَ	-	মানুষ
يَدْخُلُوْنَ	-	তারা প্রবেশ করছে
فِىْ	-	মধ্যে
دِيْنِ اللّٰهِ	-	আল্লাহর দীন
اَفْوَاجًا	-	দলে দলে
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ	-	অতঃপর আপনি প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন
رَبِّكَ	-	আপনার প্রতিপালকের
وَاسْتَغْفِرْهُ	-	এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন
اِنَّهٗ	-	নিশ্চয়ই তিনি
كَانَ	-	হন, হলেন, আছেন, রয়েছেন
تَوَّابًا	-	তওবাকবুলকারী

অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ○

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ○

২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ○

৩. তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি তো তওবাকবুলকারী।

ব্যাখ্যা

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, সূরা আন-নাস্‌র কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোনো সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। এ সূরাতে মক্কা বিজয়ের পর মানুষ যে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের এ বিজয়ের ফলে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নবুয়তী দায়িত্বের পরিপূর্ণতাও বোঝানো হয়েছে। তাই বিশিষ্ট সাহাবিগণ এ সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ওফাত নিকটবর্তী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। মহানবি (স.)-এর দুনিয়াতে আগমন ও অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে বলে এ সূরায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সূরা দ্বারা আরো বোঝানো হয়েছে যে, কোনো ব্যাপারে যখন আল্লাহ সাহায্য করেন তখন অনেক অসাধ্য কাজও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। তখন আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক।

শিক্ষা : এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ :

- আমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।
- আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সফলতা লাভ করা যায় না।
- কোনো কাজে সফলতা আসলে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত।
- যাবতীয় ত্রুটি, অপরাধ বা পাপকাজের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

অতএব, সকল সাওয়াবের কাজ করতে ও পাপকাজ থেকে বাঁচতে আমরা আল্লাহর সাহায্য চাইব। যখন আমাদের সফলতা আসবে তখন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করব। আর যদি কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আন-নাস্‌রের চারটি শিক্ষা খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

আয়াতুল কুরসি

আলোচ্য আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার ২৫৫নং আয়াত। এটি আল-কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ আয়াত।

কুরসি শব্দের অর্থ একবস্তুর সাথে অন্য বস্তুর মিলানো। এ জন্য চেয়ার বা আসনকে কুরসি বলা হয়। কেননা আসনে অনেক কাঠকে একত্র করা হয়। কুরসি শব্দের অন্য অর্থ হলো সাম্রাজ্য, মহিমা, জ্ঞান ও সিংহাসন। এ

আয়াতে আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, ক্ষমতা, মহিমা ও গৌরবের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য এ আয়াতকে আয়াতুল কুরসি বলা হয়।

ফজিলত

আয়াতুল কুরসি অত্যন্ত বরকতময় আয়াত। রাসুলুল্লাহ (স.) এ আয়াতকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে অভিহিত করেছেন। মহানবি (স.) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো বাধা থাকে না।' (নাসাই)

অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (স.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রভাতে ও শয়নকালে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিজি)

অপর এক হাদিসে এসেছে, একদা, 'রাসুল (স.) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞাসা করলেন- কুরআনের কোন আয়াতটি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ। উবাই (রা.) বললেন, তা হলো আয়াতুল কুরসি। উত্তর শুনে রাসুল (স.) তা সমর্থন করলেন এবং বললেন- হে আবুল মুনযির [উবাই (রা.)-এর ডাকনাম] এ উত্তম জ্ঞানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।' (সহিহ মুসলিম)

শব্দার্থ

اِلٰهَ	-	ইলাহ, মাবুদ,
هُوَ	-	সে, তিনি
اَلْحَيُّ	-	চিরঞ্জীব
اَلْقَيُّوْمُ	-	চিরস্থায়ী, সর্বসত্তার ধারক
لَا تَأْخُذُهٗ	-	তাঁকে স্পর্শ করে না
سِنَةٌ	-	তন্দ্রা
نَوْمٌ	-	ঘুম, নিদ্রা
اَلسَّمٰوٰتِ	-	আসমানসমূহ
اَلْاَرْضِ	-	জমিন, পৃথিবী, ভূ-পৃষ্ঠ
يَشْفَعُ	-	সে সুপারিশ করবে
عِنْدَ	-	নিকট, কাছে
خَلْفَ	-	পেছনে
لَا يُحِيْطُوْنَ	-	তারা আয়ত্ত করতে পারে না, বেষ্টন করতে পারে না
شَيْءٍ	-	জিনিস, বস্তু
عِلْمٌ	-	জ্ঞান
شَاءَ	-	তিনি ইচ্ছা করেছেন
وَسِعَ	-	তা বিস্তৃত হয়েছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে
لَا يَئُوْدُهٗ	-	তাঁকে ক্লান্ত করে না, তাঁর জন্য কষ্টকর হয় না
حِفْظٌ	-	রক্ষণাবেক্ষণ
اَلْعَلِيُّ	-	অতিমহান, সুউচ্চ
اَلْعَظِيْمُ	-	সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান

অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ

তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।

لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ

তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।

لَهٗ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ

আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সমস্ত তাঁরই।

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?

یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ

তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন।

وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।

وَسِعَ كُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ

তাঁর কুরসি আসমান ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।

وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ

আর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।

وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ○

আর তিনি অতি মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি ও ক্ষমতা এ আয়াতে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে।

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইলাহ, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। সকল ইবাদত ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি চিরকাল ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তাঁর জ্ঞান অসীম, সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। তিনি মহান সত্তা। আসমান জমিনের বিশালতা তাঁর কাছে কিছুই না। তিনি ক্লান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদির উর্ধ্বে। এককথায় তিনিই সর্বশক্তিমান, সকল শক্তির আধার, মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

> **কাজ :** আয়াতুল কুরসি পাঠের ফজিলত একটি কাগজে লিখে তা শিক্ষার্থী পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখবে।

পাঠ ১২

সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত

সূরা হাশর পবিত্র কুরআনের ৫৯তম সূরা। এ সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ ২২, ২৩ এবং ২৪তম আয়াত নিম্নে অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ফজিলত : এ তিন আয়াতের ফজিলত অত্যন্ত বেশি। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- যে ব্যক্তি সকালে তিনবার

اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(**উচ্চারণ :** আউযু বিল্লাহিস সামিইল আলিমি মিনাশ শাইতানির রাজিম।) পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করে দেবেন। তাঁরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু লাভ করবে। আর সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি এভাবে পাঠ করবে সেও এ ফজিলত লাভ করবে। (তিরমিজি)

শব্দার্থ

هُوَ	- সে, তিনি	اَلْعَزِيْزُ	- পরাক্রমশালী
اَلَّذِيْ	- যে, যিনি	اَلْجَبَّارُ	- প্রবল
عَالِمُ	- জ্ঞানী	اَلْمُتَكَبِّرُ	- অতি মহিমান্বিত
اَلْغَيْبِ	- অদৃশ্য	سُبْحَانَ	- পবিত্র, মহান
اَلشَّهَادَةِ	- দৃশ্যমান, উপস্থিত	يُشْرِكُوْنَ	- তারা শিরক করে, অংশীদার স্থাপন করে।
اَلرَّحْمٰنُ	- দয়াময়	اَلْخَالِقُ	- সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা
اَلرَّحِيْمُ	- পরম দয়ালু	اَلْبَارِئُ	- উদ্ভাবনকারী
اَلْمَلِكُ	- অধিপতি	اَلْمُصَوِّرُ	- রূপকার, রূপদাতা

اَلْقُدُّوْسُ	-	পবিত্র	اَلْاَسْمَآءُ	-	নামসমূহ
اَلسَّلٰمُ	-	শান্তি	اَلْحُسْنٰى	-	সুন্দর
اَلْمُؤْمِنُ	-	নিরাপত্তা দানকারী	يُسَبِّحُ	-	সে তাসবিহ পড়ে, মহিমা ঘোষণা করে
اَلْمُهَيْمِنُ	-	রক্ষক, রণাবেক্ষণকারী	اَلْحَكِيْمُ	-	প্রজ্ঞাময়, প্রজ্ঞাবান

অনুবাদ

	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
১.	هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ	তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।
	عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ	তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।
	هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○	তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
২.	هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ	তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।
	اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ	তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি
	الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ	তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই রক্ষক,
	الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ	তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।
	سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○	তারা যা কিছু শরিক স্থির করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান।
৩.	هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ	তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা।
	الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ	উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা।
	لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ	তাঁর জন্যই রয়েছে উত্তম নামসমূহ।
	يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ	আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।
	وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○	তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা

এ আয়াতসমূহ আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালার এসব গুণবাচক নাম তাঁর ক্ষমতা ও পরিচয়ের স্বরূপ প্রকাশ করে। তিনি সর্বশক্তিমান। আসমান জমিন সবকিছুর মালিক। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ। আসমান ও জমিনের সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সুতরাং মানুষের উচিত একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা। সর্বাবস্থায় তাঁরই ইবাদত বন্দেগি করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা হাশরের শেষের আয়াত তিনটি মুখস্থ করে অর্থসহ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৩

আল-কুরআন ও নৈতিক শিক্ষা

আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস। নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ কিতাব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কুরআন মজিদ হলো নৈতিকতার আধার। নীতি-নৈতিকতার সকল দিকই এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে নানাভাবে নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ পাঠে আমরা নৈতিক শিক্ষা প্রদানে আল-কুরআনের নানা দিকের কথা জানব।

আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। এতে আল্লাহ তায়ালার পরিচয়ও বর্ণনা রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার নানা গুণের পরিচয় পাই। যেমন- তিনি করুণাময়, অসীম দয়ালু, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ। মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া আমাদের কর্তব্য।

আল-কুরআন থেকে আমরা এসব গুণের পরিচয় লাভ করব। এরপর আমরা এগুলোর চর্চা করব। ফলে নীতি-নৈতিকতার দ্বারা আমরা আমাদের চরিত্র সুন্দর করতে পারব।

দুনিয়াতে আগমনকারী নবি-রাসুলগণের বর্ণনা রয়েছে আল-কুরআনে। এতে তাঁদের পরিচয়, তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। নবি-রাসুলগণের সফলতা, কৃতিত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি তাঁদের চরিত্রের ভূষণ ছিল। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির জন্য আদর্শ। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে তারাই সফলতা লাভ করেছে। আর আল-কুরআনের শিক্ষার দ্বারাই আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারি।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন নবি-রাসুলগণের সর্দার। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সকল গুণের পরিপূর্ণ সমন্বয় তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : "নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্রে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আল-আহযাব : ২১)

মহানবি (স.)-এর চরিত্র ও নৈতিকতার কথা কুরআন মজিদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশা (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ

অর্থ : "আল-কুরআনই তো তাঁর (রাসুলের) চরিত্র।"

অর্থাৎ আল-কুরআনের সমস্ত শিক্ষা ও নৈতিকতাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। এসব শিক্ষা অনুশীলন করে আমরাও প্রিয়নবি (স.) এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার অনুকরণ করতে পারি।

কুরআন মজিদে পূর্ববর্তী বহু জাতি ও মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যারা তাদের পাপ ও অনৈতিক কাজের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন- আদ জাতি, ছামুদ জাতি, ফিরআউন, নমরূদ, কারূন ইত্যাদি। এসব জাতি ও ব্যক্তিদের বর্ণনা আমাদের অনৈতিকতা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেয়। অতএব, তারা যেসব অনৈতিক কাজ করত তা থেকে আমরা বিরত থাকব। আর সর্বাবস্থায় নৈতিকতার অনুশীলন করব।

নৈতিক জীবনযাপনের জন্য অনেক নির্দেশনা আল-কুরআনে দেওয়া হয়েছে। এগুলো আমাদের নৈতিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। নিচে নীতিমূলক কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো:

১. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝

অর্থ : "সে-ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে। আর যে নিজেকে কলুষিত করবে সেই ব্যর্থ হবে।" (সূরা আশ্-শামস, আয়াত ৯-১০)

২. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩)

৩. اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচারের নির্দেশ প্রদান করেন।" (সূরা আন্-নাহল, আয়াত ৯০)

৪. وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ

অর্থ : "আর ক্ষমা করে দেওয়াই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৩৭)

৫. وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ۝

অর্থ : "আর তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতে) জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৪)

এভাবে আল-কুরআনের বহু আয়াতে নৈতিক গুণাবলি অনুশীলনের জন্য আদেশ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনৈতিক ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। আমরা অনৈতিকতা থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধমূলক কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

অর্থ : "তোমরা খাও ও পান কর। তবে অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ তায়ালা) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ৩১)

২. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

অর্থ :" অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৮)

৩. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۖ

অর্থ : "আর তোমরা একে অপরের পেছনে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২)

এছাড়া আরও অনেক আয়াতের দ্বারা মানবজাতিকে নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা এসব শিক্ষা জানব এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করব। ফলে আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে। আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করব।

কাজ :

ক. শিক্ষার্থীরা আল-কুরআনের নীতিমূলক আয়াত পাঁচটি অর্থসহ একজন অন্যজনের কাছে মুখস্থ বলবে।

খ. শিক্ষার্থীরা নীতিমূলক আয়াত পাঁচটি কাগজে লিখে নিজ নিজ পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখবে।

পাঠ ১৪

মোনাজাতমূলক তিনটি হাদিস

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। তিনি সর্বদাই মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন। কিসে মানুষের ভালো হবে, কী কাজ করলে মানুষ সফলতা লাভ করবে, তা দেখিয়ে দিতেন। দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের নানা পন্থা তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন। এর একটি হলো মোনাজাত। তিনি জানতেন আল্লাহ তায়ালার নিকট মোনাজাত করার মাধ্যমে আমরা সার্বিক কল্যাণ লাভ করতে পারি। এজন্য তিনি আমাদের বহু মোনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিসের কিতাবসমূহে মোনাজাতমূলক বহু হাদিস আমরা দেখতে পাই। এ পাঠে আমরা মোনাজাতমূলক তিনটি হাদিস শিখব।

হাদিস-১

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ-

অর্থ : "হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহ ফিরানোর মালিক! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও।" (সহিহ মুসলিম)

হাদিস-২

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ، وَ عَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ، وَ عَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ، وَلِسَانِىْ مِنَ الْكَذِبِ، فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ-

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে মুনাফিকি থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার চোখকে খিয়ানত থেকে, আর আমার জিহবাকে মিথ্যা থেকে পবিত্র কর। কেননা চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্পর্কে তুমি অবশ্যই অবগত।" (বায়হাকি)

হাদিস-৩

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ-

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সুস্থতা, পবিত্রতা, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার মন মানসিকতা কামনা করি।" (বায়হাকি)

উপরোক্ত মোনাজাতমূলক হাদিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো চর্চার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারি। অতএব, আমরা অর্থসহ এ মোনাজাতগুলো শিখব। এরপর এগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট মোনাজাত করব। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সর্বোত্তম সফলতা দান করবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মোনাজাতমূলক হাদিস তিনটি অর্থসহ মুখস্থ করবে এবং এগুলো দ্বারা নিয়মিত আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করবে।

পাঠ ১৫

হাদিসের আলোকে নৈতিক শিক্ষা

মানুষের জীবন ও সমাজকে সুন্দর করতে হলে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ অপরিহার্য। উত্তম চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত কোন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী। নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য তিনি সকলের নিকট প্রশংসিত ছিলেন। তাঁর নীতি-নৈতিকতা এবং আদর্শ চরিত্রের বিবরণ হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দানের জন্য মহানবি (স.)-এর আবির্ভাব। মহানবি (স.) বলেছেন-

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ-

অর্থ : "উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (বায়হাকি)

পবিত্র কুরআনে নৈতিকতা অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে। মহানবি (স.)-এর হাদিসেও নৈতিকতা অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কী কী নৈতিক গুণ অর্জন করলে মানবজীবন সুন্দর ও সফল হবে মহানবি (স.)-এর পবিত্র হাদিসে এ সম্পর্কে যেমন তার বিবরণ রয়েছে তেমনি অনৈতিক কার্যাবলি বর্জনেরও জোর তাগিদ রয়েছে।

সততা, সত্যবাদিতা, শালীনতাবোধ, সৃষ্টির সেবা, আমানত রক্ষা, ক্ষমা, দয়া, পরোপকারিতা, ধৈর্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমাজসেবা, দেশপ্রেম, পরমতসহিষ্ণুতা, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য এবং শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, সহপাঠীদের প্রতি সুন্দর আচরণ ইত্যাদি নৈতিক গুণের বিবরণ হাদিস শরিফে রয়েছে। মহানবি (স.) নিজ জীবনে এসব নৈতিক গুণ বাস্তবায়ন করে নিজেকে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

অন্যদিকে তিনি (মহানবি স.) অনৈতিক আচার আচরণ যেমন- মিথ্যাচার, পরনিন্দা, গালি দেওয়া, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, অহংকার, অশ্লীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি, সন্ত্রাস ইত্যাদি বর্জন করার জোর তাগিদ দিয়েছেন এবং এসবের কুফল ও ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তিনি তাঁর হাদিসে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

নৈতিকতা ও অনৈতিকতা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস নিম্নে বর্ণিত হলো–

দয়া-মায়া ও সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন-

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ-

অর্থ: "তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।" (তিরমিজি)

মহানবি (স.) আরও বলেন- اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ-

অর্থ : "সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয়, যে তার পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করে।" (বায়হাকি)

শালীনতা সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন- اِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ

অর্থ : "নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।" (তিরমিজি)

আমানত সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهٗ

অর্থ : "যার আমানতদারি নেই তার ইমানও নেই ।" (মুসনাদে আহমাদ)

শ্রমিকের পারিশ্রমিক দ্রুত আদায়ের তাগিদ দিয়ে মহানবি (স.) বলেন,

اُعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهٗ-

অর্থ : "শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ।" (ইবনে মাজাহ)

মহানবি (স.) এভাবে অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাকে যেমন জগতবাসীর নিকট তুলে ধরেছেন তেমনি অনৈতিকতা ও অসৎচরিত্র থেকেও বেঁচে থাকতে মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন । তাঁর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থ : "সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান, যার জিহবা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে ।" (বুখারি ও মুসলিম)

মহানবি (স.) বলেন- اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ : "তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক । কারণ, আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, হিংসা তেমনি পুণ্যকে ধ্বংস করে দেয় ।" (আবু দাউদ)

মহানবি (স.) বলেন- مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ

অর্থ : "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয় ।" (মুসলিম)

মহানবি (স.) বলেন, "মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন । কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না ।" (বায়হাকি)

মহানবি (স.)-এর পবিত্র হাদিস আমরা অধ্যয়ন করে নৈতিকতা ও সৎচরিত্র সম্পর্কে জানব এবং আমাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করব । আবার অনৈতিক কাজ ও অসৎ চরিত্রের দিকগুলো সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস জানব । এসবের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানব এবং সেসব বর্জন করে চলব । এতে আমাদের জীবন সুন্দর হবে । সবাই আমাদের ভালোবাসবে । আমরা জীবনে সফল হব । পরকালে আমরা মুক্তি ও জান্নাত লাভ করব ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মহানবি (স.)-এর হাদিসের আলোকে নৈতিক ও অনৈতিক কার্যাবলির তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে ।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ইদগাম মোট ——প্রকার।

২. আরবের ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল —— ।

৩. আয়াতুল কুরসি অত্যন্ত ——আয়াত।

৪. ——তো তার (রাসুলের) চরিত্র।

৫. যার আমানতদারি নেই তার —— নেই।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যে ব্যক্তি প্রতারণা করে	১০৬ তম সূরা
২. সূরা আল-হাশর পবিত্র কুরআনের	পাঁচটি
৩. সূরা কুরাইশ আল-কুরআনের	৫৯তম সূরা
৪. সূরা আল-ফিলের আয়াত সংখ্যা	আটটি
৫. সূরা আল-যিলযালের আয়াত সংখ্যা	সে আমার উম্মত নয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নুন সাকিন ও তানবিনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২. সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াতের প্রথম আয়াতটির অর্থ লিখ।

৩. মোনাজাতমূলক তিনটি হাদিসের যেকোনো একটির অর্থসহ ব্যাখ্যা লিখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে কুরআনের ভূমিকা বর্ণনা কর।

২. নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩. সূরা আল-কাদরের অর্থ ও শিক্ষা বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইদগামের হরফ কয়টি?

ক. দুই খ. চার

গ. ছয় ঘ. পনেরো।

২. পাপ ও অনৈতিক কাজের জন্য ধ্বংস করা হয়েছিল –

i. আদ জাতিকে

ii. ছামুদ জাতিকে

iii. বনি ইসরাইলকে

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সাদী প্রথম রমযানের দিনে কুরআন তিলাওয়াতের সময় নুন সাকিন বা তানবিনের পর হরফ আসলে ঐ নুন সাকিন বা তানবিনকে মীম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ গুন্নাহসহ পড়েন। আর দ্বিতীয় রমযানে তিলাওয়াতের সময় মীম সাকিনের পর বা (ب) আসলে ঐ মীম সাকিনকে চার আলিফ গুন্নাহসহ পড়েন।

৩. সাদীর প্রথম রমযানের তিলাওয়াতকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়?

ক. ইযহার
খ. ইদগাম
গ. ইখফা
ঘ. ইকলাব।

৪. সাদীর দ্বিতীয় রমযানের তিলাওয়াতে চার আলিফ গুন্নাহর স্থলে কত আলিফ পরিমাণ গুন্নাহসহ পড়া উচিত ছিল ?

ক. এক
খ. দুই
গ. তিন
ঘ. পাঁচ।

৫. সাদীর প্রথম রমযানের তিলাওয়াতের জন্য পরকালে পাবে–

i. শান্তি

ii. স্বস্তি

iii. মুক্তি

কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তাসিন ও তাসনিম দুই বন্ধু। তারা উভয়েই রমযান মাসের শেষ বিশ দিন ইবাদতে ব্রতী হওয়ার সংকল্প করেন। ফলে তাসিন রমযানের বিশ তারিখ হতে নিকটবর্তী মসজিদে ইতিকাফের মাধ্যমে ইবাদত বন্দেগিতে রত থাকেন। অপরপক্ষে তাসনিম ইতিকাফে যোগদান না করলেও কুরআন খতম করার মানসিকতা নিয়ে প্রতি রাতে তাড়াতাড়ি ও অস্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন।

ক. আন্-নুর শব্দের অর্থ কী?

খ. "আযিযুন আলাইহি" বাক্যটি ইযহারের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর।

গ. তাসনিমের কুরআন তিলাওয়াতে শরিয়তের কোন বিধানটি লঙ্ঘিত হয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তাসিন রমযানের শেষ দশ দিনের বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করার মূল রহস্য সূরা আল-কাদরের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. আলম ও সালাম দুই ভাই। আলম সাহেব নিয়মিত নামায আদায় করেন না। তবে তিনি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মানসে বিভিন্ন মসজিদে নামায আদায়ের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। অপরপক্ষে সালাম সাহেব নিয়মিত নামায আদায়ের পাশাপাশি ছোট ছোট পাপ থেকেও বিরত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

ক. ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস কয়টি?

খ. "গাফুরুন রাহিমুন" বাক্যটি ইদগামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর।

গ. আলম সাহেবের বিভিন্ন মসজিদে নামায আদায়ের মাধ্যমে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সালাম সাহেবের প্রচেষ্টাটি সূরা আল-যিলযালের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (اَلْأَخْلَاقُ)

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের প্রকাশ পায় তাকে আখলাক বলে। আখলাক (اَخْلَاقٌ) আরবি শব্দ 'খুলুকুন" (خُلُقٌ) এর বহুবচন। যার অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সকল দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- সদাচরণের ধারণা, ধৈর্য, ভ্রাতৃত্ব, নারীর মর্যাদা, সমাজসেবা, দেশপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণনা করতে পারব।
- অসদাচরণের ধারণা, অহংকার, অশ্লীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি, ঘুষ, সন্ত্রাস এগুলো পরিহারের গুরুত্ব ও প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইচআইভি-এর ধারণা ও ইসলামের দৃষ্টিতে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

আখলাকের প্রকার : আখলাক দুই ভাগে বিভক্ত।

১. আখলাকে হামিদাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

মানবজীবনের উত্তম গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্র বলে। যেমন– ধৈর্য, সততা, দেশপ্রেম, সমাজসেবা প্রভৃতি। এ সকল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সমাজে নন্দিত ও সম্মানিত।

২. আখলাকে যামিমাহ (اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ)

মানবজীবনের নিকৃষ্ট চরিত্রকে আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন– অহংকার, ঘৃণা, মিথ্যাচার, সুদ, ঘুষ, অশ্লীলতা প্রভৃতি। এ সকল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত।

আখলাকের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে আখলাকের গুরুত্ব সর্বাধিক। আখলাকই উন্নত জাতির জীবনীশক্তি। যে জাতির চরিত্র যত ভালো থাকে, সে জাতি তত শক্তিশালী। যে জাতির চরিত্র ঠিক নেই, সে জাতি পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না। সকল নবিই

নিজ নিজ জাতিকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। আর উন্নত চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন। মহানবি (স.) বলেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : "উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (বায়হাকি)

উত্তম চরিত্র ব্যক্তিকে সুন্দর ও উন্নত করে। আর সমাজের সকল মানুষ চরিত্রবান ব্যক্তিকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। অপরদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তি সকলের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দিত। যার চরিত্র যত উন্নত ধর্মের দিক থেকেও সে তত অগ্রসর।

নবি করিম (স.) বলেন- اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ

অর্থ : "উত্তম চরিত্রই হলো সকল নেক কাজের মূল কথা।" (মুসলিম)

চরিত্র মানুষের ভূষণ। চরিত্রবলেই মানুষ সর্বত্র সমাদৃত হয়। ভালো চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি অধিকতর ইমানদার হয়।

মহানবি (স.) বলেন – أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

অর্থ : "চরিত্রের বিচারে যে লোক উত্তম, মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণতম ইমানের অধিকারী।" (আবু দাউদ ও দারিমি)

কিয়ামতের দিন পরিমাপদণ্ডে উত্তম চরিত্রের ওজন হবে অত্যন্ত ভারী।

নবি করিম (স.) বলেন, "মুমিনের পরিমাপদণ্ডে কিয়ামতের দিন উত্তম চরিত্র অপেক্ষা ভারী জিনিস আর কিছুই নেই।" (তিরমিজি)

উত্তম চরিত্র মানুষের পাপকে খণ্ডন করে দেয়। নবি করিম (স.) বলেন, "উত্তম চরিত্র পাপকে এমনভাবে বিগলিত করে যেমনভাবে সূর্যতাপ বরফকে বিগলিত করে।" (তাবারনি, বায়হাকি)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আখিরাতে তার উত্তম চরিত্রের বিনিময়ে অত্যধিক মর্যাদা লাভ করবে। মহানবি (স.) বলেন, "বান্দা তার উত্তম চরিত্রের বলে আখিরাতে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানিত স্থানে উন্নীত হবে, যদিও সে ইবাদতের দিক থেকে দুর্বল থাকে।" (তাবারানি)

আমরা উত্তম চরিত্র অর্জন করব। নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার করব। আমরা দুনিয়াতে সকলের কাছে প্রিয় হব। পরকালে অশেষ মর্যাদা লাভ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আখলাকে হামিদাহ-এর (সদাচরণের) সুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ২

কতিপয় আখলাকে হামিদাহ (اَلْاَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

ধৈর্য

ধৈর্য এর আরবি প্রতিশব্দ 'সবর' (اَلصَّبْرُ) । যার অর্থ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিরত রাখা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে সহিষ্ণুতার সাথে আল্লাহর বিধান মোতাবেক সকল কর্তব্য পালন করাকে ধৈর্য বলে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধৈর্য বিশ্লেষণ করলে এর তিনটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. অবৈধ ও হারাম বস্তু থেকে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে বিরত রাখতে ধৈর্যধারণ করতে হয়।

২. আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করতে হয়।

৩. যেকোনো বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করতে হয়।

তাৎপর্য

ধৈর্য মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। এটি মানবজীবনের সফলতার চাবিকাঠি। ধৈর্যের অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় না। ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন কাজ তথাপি সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য তা করা অপরিহার্য। সমাজ জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণময় জীবনযাপনের জন্য ধৈর্যের (সবরের) গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে অফুরন্ত প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অর্থ : "অবশ্যই ধৈর্যশীলগণকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে।" (সূরা আয্-যুমার, আয়াত -১০)

ধৈর্যের বিপরীত হচ্ছে অধৈর্য। অধৈর্য মানুষকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। এ কারণে জীবনে চলার পথে মানুষকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে।

মানুষের জীবনে আসে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, সফলতা-বিফলতা ও জয়-পরাজয়। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের প্রয়োজন হয়। বিপদে যেমন সুদিনের আশায় ধৈর্যধারণ করতে হয়, তেমনি সুদিনে আত্মহারা না হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হয়। সুখশান্তি প্রাপ্তিতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে, জীবনে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন ধৈর্যশীল। বিখ্যাত নবি হযরত ইবরাহিম (আ.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। জালিম শাসক নমরুদের মূর্তিপূজার বিরোধিতা করায় তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চান নি। এমনিভাবে হযরত আইয়ুব (আ.)ও কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর দেহে পচন ধরেছিল। শরীর থেকে গোশত খসে পড়েছিল। আত্মীয়স্বজন তাঁকে ত্যাগ করেছিল। তাঁর সন্তানাদি মারা গিয়েছিল। তাঁর ঘরবাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এমন কঠিন মুহূর্তেও তিনি ধৈর্যহারা হননি। আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)ও ধৈর্যের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ধৈর্য ছিল অতুলনীয়। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তবু ধৈর্য হারাননি। সকল বিপদেই তিনি ছিলেন অটল ও অবিচল।

শরিয়তের বিধান পালন করতেও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, রমযান মাসের সিয়াম পালন, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হজ সম্পাদন, সঞ্চিত সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচুর ধৈর্যধারণ করতে হয়।

এমনিভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়জীবনের বিভিন্ন স্তরে ধৈর্যধারণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা সকল বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করব। বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করব। আমরা ধৈর্যশীল হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ধৈর্যধারণের সুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩

ভ্রাতৃত্ব (اَلْاُخُوَّةُ)

পরিচয়

উখ্ওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ ভ্রাতৃত্ব। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্ব বলে। মানুষের মাঝে এ হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে।

ভ্রাতৃত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

১. ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব, ২. বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং ৩. ইসলামি ভ্রাতৃত্ব।

ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব

একই পিতার ঔরসে বা একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করার কারণে যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয় তাকে ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব বলে।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব

পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)। এ কারণে বিশ্বের সকল মানুষই ভাই ভাই। ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি এবং বর্ণ ও ভাষার মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। আর এভাবে মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবু তারা পরস্পর ভাই ভাই। কারণ তারা সবাই এক আদম (আ.) হতে সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ

অর্থ : "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

রাসুল (স.) বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই আদম (আ.) হতে এবং আদম মাটি হতে সৃষ্টি।" (বুখারি)

এ আয়াত ও হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব

আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম, ইসলামের মূলবাণী, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল। যারা এই কালিমায় বিশ্বাসী তারা যেকোনো বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও অঞ্চলের অধিকারী হোক না কেন, তারা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুমিনগণ ভাই ভাই।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১০)

হাদিসে রাসুল (স.) বলেন,

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ

অর্থঃ "মুসলমান মুসলমানের ভাই।" (বুখারি ও মুসলিম)

ইসলামি ভ্রাতৃত্বের তাৎপর্য

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। ইসলামে উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর বিশ্বের সকল মুসলমান পরস্পরের ভাই। একই দীনসূত্রে আবদ্ধ। মহানবি (স.) বলেন, "অনারবগণের ওপর যেমন আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি আরবগণের ওপরও অনারবগণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এতই সুদৃঢ় যে, আল্লাহর রাসুল (স.) পৃথিবীর সকল ইমানদারগণকে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন। দেহের কোনো একটি অঙ্গে অসুখ হলে যেমন পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি পৃথিবীর কোনো একপ্রান্তে একজন মুসলিম বিপদে পতিত হলে সকল মুসলমানের অন্তর ব্যথিত হয়। কোনো মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এমনকি যদি কখনো পরস্পরের মধ্যে কোনো কলহ সৃষ্টি হয় তখন অপর মুসলমান ভাইয়েরা তা মিটিয়ে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। কোনো মুসলমান নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করবে অন্যথায় সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না। প্রিয় নবি (স.) বলেন, "মুমিনগণ পরস্পর মিলে একটি ইমারতস্বরূপ, এর এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে রাখে।" (বুখারি ও মুসলিম)

আমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকব। সুখে-দুঃখে একে অপরের সঙ্গে শরিক থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সুফলগুলো লিখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৪
নারীর মর্যাদা

পরিচয়

ইসলামে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর আদি পুরুষ হযরত আদম (আ.) এবং আদি নারী বিবি হাওয়া (আ.)। আর এ দুইজন থেকে পৃথিবীর সকল নর-নারীর সৃষ্টি। ইসলামে নর ও নারী উভয়ের সমমর্যাদা স্বীকৃত। মাতা, কন্যা, ভগ্নী, স্ত্রী প্রভৃতি হিসেবে সমাজে নারীদের যে বিশেষ অধিকার ও স্থান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করলে নারীর মর্যাদা সমুন্নত হবে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য না করে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল করুণ। সেখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হতো। কোনো কোনো সম্প্রদায় কন্যাসন্তানকে জীবিত কবর দিত।

কুরআন মজিদে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- "তাদের কাউকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯)

মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের পর নারী ফিরে পায় স্বীয় মর্যাদা। ইসলামে বলা হয়েছে-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ-

অর্থ : "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" (নাসায়ি)

নবি করিম (স.)-এর একটি হাদিসে পিতা অপেক্ষা মায়ের অধিকার বেশি বলে উল্লেখ আছে। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে নারী পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোনো আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা একে অপরের অংশ।" (সূরা আলে ইমরান, ১৯৫)

ইসলামে স্বামীর সংসারে স্ত্রীর বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط

অর্থ : "তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা (স্বামীরা) তাদের ভূষণ।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৭)

মহান আল্লাহ্ আরও ঘোষণা করেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২৮)

নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার ব্যাপারে মহানবি (স.) বিদায় হজের ভাষণে বলেন,

অর্থ : "তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তাদের গ্রহণ করেছ।" (মুসলিম)

সম্পত্তি লাভের বেলায়ও ইসলাম নারীকে পিতা ও স্বামীর উভয়ের সম্পত্তির অধিকারিণী করেছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যার্জন এবং অর্থ উপার্জনে ইসলাম নারীদের অনুমতি দান করেছে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায় যে, পিতা-মাতার ইনতিকালের পর উত্তরাধিকারসূত্রে যা প্রাপ্য তা নারীদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের কাজ কুরআন সুন্নাহর আলোকে হারাম। যারা এরূপ করবে পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আমরা এ পাঠে জানলাম

১। নারীর মর্যাদা।

২। নারীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মহানবি (স.)-এর তাগিদ।

আমরা নারীসমাজকে যথাযথ মর্যাদা দেব। তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ইসলাম কীভাবে নারীদের মর্যাদা দিয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

সমাজসেবা (خِدْمَةُ الْمُجْتَمَعِ)

পরিচয়

সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে স্বেচ্ছায় গৃহীত কাজকে সমাজসেবা বলে। ব্যাপক অর্থে মানবকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল কর্মসূচিই সমাজসেবা নামে পরিচিত।

তাৎপর্য

সমাজে নানা শ্রেণি ও পেশার লোক বাস করে। তারা সকলে সমান নয়। তাদের সুযোগ-সুবিধাও সমান নয়। কেউ বিপুল সম্পদের অধিকারী আবার কেউ কপর্দকহীন। সম্পদশালী ব্যক্তিগণ অভাবী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নেও তাঁদের সম্পদ ব্যয় করবে। সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠান গড়বে। এটাই ইসলামের নির্দেশ। মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ○

অর্থ : "এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।" (সূরা আল-যারিয়াত, আয়াত ১৯)

অর্থশালী ব্যক্তি সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণে এমন প্রতিষ্ঠান গড়বে, যে প্রতিষ্ঠানে অভাবী লোকেরা কাজ করে তাদের আর্থিক সমস্যার সুরাহা করবে। বাঁচার অবলম্বন খুঁজে পাবে। গ্রামের উন্নয়নের বিরাট বাধা

দূর করার জন্য গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাসহ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সমাজসেবামূলক কাজ।

সমাজকে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ

অর্থ : "পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক, আয়াত ১)

হাদিসে বলা হয়েছে– طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

অর্থ : "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজা ও বায়হাকি)

সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর হবে। সমাজ সংশোধনমূলক প্রতিটি কার্যক্রমই সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। সমাজে কোনো বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ সৃষ্টি হলে তা দূর করতে হবে। কারণ বিশৃঙ্খলা সমাজের পরিবেশকে নষ্ট করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

অর্থ : "ফিত্না (বিশৃঙ্খলা) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯১)

সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা করা, পরস্পরের কলহ ও দ্বন্দ্ব মেটানো সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ৯)

সর্বস্তরের জনগণের উপকারে আসে এমন সব কাজের অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই করা দরকার। যেমন– ভাঙা রাস্তা মেরামত করা, নতুন রাস্তা নির্মাণে সাহায্য করা, পুল-সাঁকো নির্মাণ করা, রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা করা, আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া, রাস্তার পাশে ছায়াদার বৃক্ষ রোপণ করা, বৃক্ষ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

জনসেবা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য লাভ করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "আল্লাহ বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।" (মুসলিম)

আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে–

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ -

অর্থ : "জাতির নেতা তিনিই যিনি তাদের সেবক।"

সমাজ সেবা মানবিক দায়িত্ব। আমরা সমাজের সেবা করব। সমাজকে ভালো করে গড়ে তুলব। সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব। মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সমাজসেবা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সমাজসেবামূলক কাজের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

পরিচয়

জন্মভূমির প্রতি মানুষের অন্তরে একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং ভালোবাসা জন্মায়। ক্রমান্বয়ে এ আকর্ষণ বা ভালোবাসা বিস্তৃতি লাভ করে সমগ্র দেশ, দেশের মাটি ও দেশের জনগণের প্রতি। মাতৃভূমি তথা দেশের প্রতি এ প্রীতি ও দরদের আকর্ষণকেই দেশপ্রেম বলে।

দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। দেশপ্রেমের মূলেই আছে দেশের ভূখণ্ডকে ভালোবাসা।

দেশের জনগণকে ভালোবাসা, দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি-নীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা কর্তব্য।

গুরুত্ব

দেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম দেশপ্রেমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহানবি (স.) তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, মক্কার অধিবাসীদের ভালোবাসতেন। তাদের হিদায়াতের জন্য তিনি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেন। কাফিরদের অত্যাচারে সাহাবিগণকে মহানবি (স.) আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেও তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে কাফিরদের কঠিন ষড়যন্ত্রের কারণে এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন মক্কার দিকে বার বার ফিরে তাকান, আর কাতর কণ্ঠে বলেন-

"হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার আপন গোত্রীয় লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"

সাহাবিগণও স্বদেশ মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন। মদিনায় হিজরতের পর হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত বিলাল (রা.) কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন। তখন তাঁরা মক্কার তৃণলতা, পাহাড়-পর্বত এবং পানির কথা স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণের এ অবস্থা দেখে বলেন,

"হে আল্লাহ! আমরা মক্কাকে যেরূপ ভালোবাসি, তদ্রূপ অথবা তার চেয়েও অধিকভাবে আপনি আমাদের অন্তরে মদিনার প্রতি ভালোবাসা দান করুন।" (বুখারি)

দেশপ্রেম মানুষকে দেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমিক নিজের জানমাল উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "দেশরক্ষায় একদিন এক রাতের প্রহরা (রিবাত) ক্রমাগত এক মাসের রোযা এবং সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম।" (মুসলিম)

বলা হয়–

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ

অর্থ : "দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।"

দেশপ্রেম মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করে তোলে। দেশের উন্নতিসাধনে সজাগ রাখে। দেশের সম্পদ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে।

আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব, দেশের উন্নতি করব। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে দেশকে কীভাবে ভালোবাসা যায় তা আলোচনা করবে।

পাঠ ৭

পরমতসহিষ্ণুতা

পরিচয়

পরমত বলতে বুঝায় অপরের মত, পথ বা আদর্শ, সেটা ধর্মীয় হতে পারে এবং আদর্শিকও হতে পারে। আবার রাজনৈতিকও হতে পারে। অন্যের মতামতকে অবজ্ঞা না করে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া বা অন্যের মত বা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে।

অন্যের ধর্মীয় মতামত বা রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে। পরমতসহিষ্ণুতা মানবচরিত্রের প্রশংসনীয় গুণ। এ গুণটির কারণেই সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। এ গুণটির কারণেই মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সদ্ভাব বজায় থাকে।

গুরুত্ব

পারিবারিক শান্তি লাভ

একটি সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবনের জন্য পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি এর উপর নির্ভরশীল। পরিবারের অন্য সদস্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করার মাধ্যমে পারিবারিক শান্তি লাভ করা যায়।

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

পারিবারিক সুখ-শান্তির মতো সামাজিক সুখ-শান্তিও পরমতসহিষ্ণুতার ওপর নির্ভরশীল। সমাজে বিভিন্ন মতাদর্শের লোক থাকতে পারে, তাদের সাথে সমঝোতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। তাদের মতের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করলে শান্তি বজায় থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মতামত ও আদর্শের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। তাহলেই সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা

পরমতসহিষ্ণুতার ওপর রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলা নির্ভরশীল। একটি দেশে নানা ধর্ম, বর্ণ ও মতের লোক বসবাস করে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, সমঝোতা ও সহাবস্থানের জন্য পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য।

আন্তর্জাতিক স্থীতিশীলতা

পরমতসহিষ্ণুতার কারণেই আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর অভাবে পারস্পরিক সহাবস্থান কঠিন হয়ে যায়। আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক লাভের প্রধান পূর্বশর্ত পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ। ভিন্ন দেশ ও সমাজের আদর্শ, রীতিনীতি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন ও পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পরমতসহিষ্ণুতার সুফলগুলোর একটি তালিকা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৮

আখলাকে যামিমাহ (أَخْلَاقٌ ذَمِيمَةٌ)

পরিচয়

যে খারাপ কাজ বা আচরণ মানুষকে হীন ও নিন্দনীয় করে তোলে তাকে আখলাকে যামিমা বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন– অহংকার, ঘুষ, অশ্লীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি।

অপকারিতা

আখলাকে যামিমাহ এর কারণে ওইসব ব্যক্তি সমাজ জীবনে নিন্দনীয় হয়। তারা মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের দ্বারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। অন্যায় ও অসৎ কাজের প্রসার ঘটে। তারা আল্লাহ ও রাসুলের অপ্রিয় হয়। এর ফলে তারা পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে।

তাই আমাদের সকলকে আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় চরিত্র থেকে দূরে থাকতে হবে। এর ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, পরিবেশ হবে সুন্দর, মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করা সম্ভব হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আখলাকে যামিমাহ এর অপকারিতা সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৯

অহংকার

পরিচয়

অহংকার শব্দের অর্থ অহমিকা, আমিত্ব, গর্ব, দর্প, দম্ভ, বড়াই, নিজেকে বড় ভাবা ইত্যাদি। নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় গণ্য করা এবং অন্যকে তুচ্ছও নিকৃষ্ট মনে করাকে অহংকার বলা হয়। যে অহংকার করে তাকে অহংকারী বলে। অহংকারী ব্যক্তি বিভিন্ন দিক থেকে নিজেকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেয় এবং নিজেকে অন্যদের তুলনায় উত্তম মনে করে।

অহংকারের ধরন তিনটি

১. অন্তরে অহংকার পোষণ করা।

২. চালচলন ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করা।

৩. কথাবার্তায় অহংকার প্রকাশ করা।

মানুষ বংশ, সম্পদ, সৌন্দর্য, শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে অহংকার করে থাকে। যেমন ধনী ও সম্পদশালীর মধ্যে অর্থের গৌরব, স্ত্রীলোকদের মধ্যে সৌন্দর্যের বড়াই এবং ক্ষমতাবানদের মধ্যে ক্ষমতার দম্ভ, বিদ্বান লোকদের মধ্যে বিদ্যার গর্ব ইত্যাদি।

অপকারিতা

অহংকারের কুফল অনেক এবং এর অপকারিতা বর্ণনাতীত। অহংকারের কারণেই ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী :

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

"তুমি এ স্থান হতে নেমে যাও। এ স্থানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৩)

অহংকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ঘৃণিত। আল্লাহর কাছে অপছন্দণীয় ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৮)

মহানবি (স.) এ বিষয়ে বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ-

অর্থ : "যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম)

প্রতিটি মানুষের কোনো না কোনো অভাব আছে। সুতরাং অহংকার করা তার জন্য শোভা পায় না। অহংকার শুধু তাঁরই শোভা পায়, যার কোনো অভাব নেই। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,
"আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, অহংকার আমার ভূষণ।" (মুসলিম)
আমরা অহংকার বর্জন করব। কেননা মানুষের কোনো জিনিস নিয়েই অহংকার করার অবকাশ নেই।
আমরা এ পাঠে শিখলাম, অহংকার পতনের মূল। অহংকারী অভিশপ্ত। আমরা অহংকার করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কী কী কাজ করলে অহংকার প্রকাশ পায় তার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০

অশ্লীলতা

পরিচয়

অশ্লীলতা অর্থ জঘন্যতা, কদর্যতা, নির্লজ্জতা, অভদ্রতা ও যৌন বিষয়ক কুৎসিত আচরণ। অশ্লীলতার দ্বারা নির্লজ্জ ও কুরুচিপূর্ণ কথা ও কাজকে বোঝানো হয়। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতাসহকারে প্রকাশ্যে করা হয় সেগুলোকেও অশ্লীল বলা হয়।

কুফল

অশ্লীলতা একটি বড় অপরাধ। এটা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। সমাজকে কলুষিত করে। নিষ্পাপ ও কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র হনন করে যুবক-যুবতীদের কুকর্মের প্রতি প্রলুব্ধ করে।

আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

"বলুন, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।" (সূরা আল্-আরাফ, আয়াত ৩৩)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

"প্রকাশ্য কিংবা গোপন অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না।" (সূরা আল্-আনআম, আয়াত ১৫১)

অশ্লীল আচরণকারী সকলের নিকট ঘৃণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

"যার মধ্যে অশ্লীলতা আছে, তা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে। আর যার মধ্যে লজ্জাশীলতা আছে, তা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।" (তিরমিজি)

অশ্লীলতা মানুষের পারলৌকিক জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

اَلْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلٰى كُلِّ فَاحِشٍ اَنْ يَّدْخُلَهَا

অর্থ : "প্রত্যেক অশ্লীল আচরণকারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম।" (কানযুল উম্মাল)

অশ্লীলতা ত্যাগ করা মুমিন বান্দার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

অর্থ : "তারাই (মুমিন) যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে।" (সূরা আশ-শূরা, আয়াত ৩৭)

প্রতিকার

১. ইসলামের নীতি ও আদর্শের অনুশীলন,

২. পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং

৩. সচেতনতার পাশাপাশি আইনি প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

অশ্লীল কথা, কর্ম ও অপরাধকে সবাই ঘৃণা করে। অশ্লীলতা, অসভ্যতা ও বর্বরতার প্রতীক। অশ্লীল আচরণ ও কর্ম থেকে আমরা বিরত থাকব, অন্যকেও বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অশ্লীলতার প্রতিকার সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

পরশ্রীকাতরতা (اَلْحَسَدُ)

পরশ্রীকাতরতা অর্থ অন্যের উন্নতি ও সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা প্রকাশ করা। অর্থাৎ কারো ধন-দৌলত, সম্মান, ভালো ফল বা উচ্চ মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া এবং তার ধ্বংস কামনা করাকে পরশ্রীকাতরতা বলা হয়।

কুফল

পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি বহু কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন শত্রুতা, অহংকার, নিজের অসদুদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি। এসব কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা বিদ্বেষ করে থাকে। ইসলাম এ কাজগুলো হারাম ঘোষণা করেছে। পরশ্রীকাতরতার অপকারিতা সীমাহীন। হযরত আদম (আ.)-এর পদমর্যাদা দেখে ইবলিস তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। ফলে সে অভিশপ্ত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার দয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

মানব সৃষ্টির পর ঈর্ষার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল পরশ্রীকাতরতার বশবর্তী হয়ে তারই আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। পরশ্রীকাতরতা মানুষের পুণ্য কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন,

اِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ : "আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয় পরশ্রীকাতরতা তেমনই পুণ্যকে ধ্বংস করে দেয়।" (মুসনাদি শিহাব)

পরশ্রীকাতরতা মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে। মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। সমাজের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে। পরশ্রীকাতরতা সমাজে ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি ও অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে পরশ্রীকাতরতা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

অর্থ : "আর হিংসুকের (পরশ্রীকাতরতার) অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।" (সূরা আল-ফালাক, আয়াত ৫)

আল্লাহ তায়ালা হিংসা বর্জনকারীকে ভালোবাসেন। হিংসা বর্জনকারী জান্নাত লাভ করবেন। প্রিয় নবি (স.) একবার তার এক সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দেন। তিনি কী আমল করেন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি (সাহাবি) বলেন আল্লাহ তায়ালা যাকে কোনো উত্তম বস্তু দান করেছেন আমি তার প্রতি কখনই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনে মাজাহ)

আমাদের প্রতিজ্ঞা

আমরা পরশ্রীকাতর হব না। নিজের পতন নিজে ডেকে আনব না। হিংসা করব না। সমাজের শান্তি বিনষ্ট করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পরশ্রীকাতরতার কুফলের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবে।

পাঠ ১২

ঘৃণা (اَلْبُغْضُ)

পরিচয়

ঘৃণা অর্থ অবজ্ঞা, অপছন্দ, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, তুচ্ছ জ্ঞান করা। কাউকে তুচ্ছ মনে করে তাকে সহ্য করতে না পারা এবং তার থেকে দূরে সরে থাকাকেই পরিভাষায় ঘৃণা বলে।

অহংকার, শত্রুতা, পদমর্যাদার লিপ্সা প্রভৃতি কারণে ঘৃণার উদ্রেক ঘটে। ঘৃণা করা অন্যায় তবে ক্ষেত্রবিশেষ ঘৃণা একটি মানবীয় গুণ। যেমন মন্দ কাজে ঘৃণা করা প্রশংসনীয়। সমাজে চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, হেরোইন সেবন ইত্যাদি ঘৃণিত কাজ। এগুলোকে ঘৃণা করা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। তবে মনে রাখতে হবে পাপ কাজকে ঘৃণা করব পাপীকে নয়।

কুফল

অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণা একটি মহা গুরুতর ব্যাধি। এতে বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। ঘৃণাকারী কখনো মনে শান্তি লাভ করতে পারে না। এতে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি সাধিত হয়।

মহানবি (স.) বলেন, دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ

অর্থ: "পূর্ববর্তী উম্মাতের দুটি রোগ তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে, হিংসা এবং ঘৃণা।" (বায়হাকি)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, "তোমরা একে অপরকে হিংসা করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না, একে অন্যের ক্ষতি করার জন্য কৌশল করো না বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।" (বুখারি ও মুসলিম)

ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য শয়তানের বৈশিষ্ট্য। শয়তান হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি তাচ্ছিল্য করার কারণেই অভিশপ্ত হয়েছে। আমরা কাউকে ঘৃণা করব না।

আমরা ঘৃণার কুফল উপলব্ধি করব। সকলের প্রতি উদার হব। ভালো কাজে প্রশংসা করব। অর্থ, বিদ্যা বা সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিতে কাউকে ঘৃণা বা হেয় করব না। তবে মন্দ কাজকে ঘৃণা করব। মন্দ কাজকে ঘৃণা না করলে সমাজে তা ধীরে ধীরে বৈধ বলে পরিগণিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ঘৃণার কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৩

চৌর্যবৃত্তি

পরিচয়

চৌর্য অর্থ চুরি। চৌর্যবৃত্তি অর্থ চোরের পেশা অথবা চোরের কাজ। কারো মালিকানাভুক্ত সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে হাতিয়ে নেয়ার নাম চুরি বা চৌর্য।

চুরির কুফল

নিরাপত্তাহীনতা :

চুরির জন্য সম্পদ ও জীবন নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। কারণ কখনো কখনো চোর ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মালিককে খুনও করে।

সামাজিক শান্তি বিনষ্ট :

চৌর্যবৃত্তির কারণে মানুষ শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। সম্পদ পাহারা দিতে নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়। সর্বদা সম্পদ চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সামাজিক শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্ট হয়।

সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি :

চুরির দ্বারা সমাজে আরও নতুন নতুন অপরাধ সৃষ্টি হয়। চোর শুধু তার কাজ চুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না বরং সে চুরি, ছিনতাই, অপহরণ, খুন এবং মাঝে মাঝে সম্ভ্রমহানির ঘটনাও ঘটায়।

চৌর্যবৃত্তি একটি ঘৃণিত কাজ :

সমাজের নিন্দনীয় কাজগুলোর অন্যতম চৌর্যবৃত্তি। সমাজে চোরকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। চোরকে মানুষ আত্মীয় হিসাবে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। পরিবার ও সমাজের লোকেরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

পরকালীন শাস্তি :

চুরি একটি অত্যন্ত জঘন্য ধরনের নিষিদ্ধ কাজ। এর ফলে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তার জন্য পরকালেও ভয়াবহ শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন।

চুরি প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা :

চুরির জন্য পরকালে শাস্তির অঙ্গীকার ছাড়াও এ অনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য ইসলাম পার্থিব দণ্ডবিধানও দিয়েছে।

প্রতিকার

১. মৌলিক প্রয়োজন মেটানো

কেউ যাতে অন্ন, বস্ত্র বা মৌলিক চাহিদার অভাবে চুরি না করে তার জন্য সেসবের ব্যবস্থা করতে হবে। তার কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

২. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা

অভাব না থাকা সত্ত্বেও স্বভাবগত কারণে কেউ যদি চুরি করে তাহলে সব দেশ এবং সব সমাজেই সেজন্য শাস্তির বিধান রয়েছে, ইসলাম ধর্মেও তার জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ

অর্থ : "পুরুষ চোর আর মহিলা চোর তাদের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩৮)

৩. নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের অন্তরে চৌর্যবৃত্তির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। চোরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার মাধ্যমে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা।

ধর্মীয় প্রতিকার

চুরি শুধু সামাজিক অপরাধই নয়, ধর্মীয় বিবেচনায় একটি হারাম কাজ। দুনিয়ায় ঘৃণা ও শাস্তি ছাড়াও আখিরাতে এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে চৌর্যবৃত্তির প্রতিকারের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৪

ঘুষ (اَلرِّشْوَةُ)

পরিচয়

ঘুষ অর্থ উৎকোচ। এর আরবি প্রতিশব্দ 'রেশওয়াত'। অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিকই ঘুষ। কর্তব্যরত কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়া ঘুষের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে উপঢৌকন গ্রহণ করাও ঘুষ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল, আর এ সুপারিশের প্রতিদানস্বরূপ তাকে কিছু উপহার দেওয়া হলে, সে যদি তা গ্রহণ করে, তবে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হবে।" (কিতাবুল কাবায়ির)

কুফল

ঘুষ একটি সামাজিক অপরাধ। ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। ঘুষ গ্রহীতাকে সকলে ঘৃণা করে। ঘুষ গ্রহণ এবং দেওয়া দুটিই পাপ কাজ। ঘুষ গ্রহীতা ও দাতার ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ বর্ষিত হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ ـ

অর্থ: "ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।" (ইব্‌ন মাজাহ্‌)

ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই অমার্জনীয় অপরাধ। ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামি। রাসুল (স.) বলেন,

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ كِلَاهُمَا فِى النَّارِ ـ

অর্থ : "ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামি।" (তাবারানি)

কোনো কর্মচারী তার বেতনের অতিরিক্ত জনগণ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা অবৈধ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "কোনো ব্যক্তিকে যদি আমরা কোনো কাজে নিয়োগ করি এবং এ জন্য তাকে বিনিময় দান করি, আর সে বিনিময়ের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে তা খিয়ানত হিসাবে গণ্য হবে।" (আবু দাউদ)

ঘুষ প্রতিরোধে ইসলামি বিধান

ইসলাম ঘুষকে হারাম ঘোষণা করেছে। মুমিনদের ঘুষ আদান প্রদান না করার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে।

মহান আল্লাহ ঘুষের সম্পদকে হারাম ও অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। মুমিনদের দায়িত্ব হলো এ নিষিদ্ধ অপবিত্র কাজে অংশগ্রহণ না করা।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী,

"আপনি বলুন, হারাম ও অপবিত্র জীবিকা এবং পবিত্র জীবিকা সমান নয়। যদিও হারামের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে। কাজেই হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর- যাতে সফলকাম হতে পার।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ১০০)

কিয়ামত দিবসে ঘুষ গ্রহীতার পরিণতি হবে খুবই লজ্জাজনক। মহানবি (স.) বলেছেন- "যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! ব্যক্তি যা ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়েই উপস্থিত হবে।"

সর্বোপরি মহানবি (স.) ঘুষদাতা ও গ্রহীতার জন্য জাহান্নামের সংবাদ দিয়েছেন।

আমরা সমাজকে ঘুষের অভিশাপ থেকে মুক্ত করব। নিজেরা কখনো ঘুষ আদান-প্রদান করব না।

সামাজিক অপরাধ হিসাবে এ অভিশপ্ত কাজ প্রতিরোধ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ঘুষের সামাজিক কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৫

সন্ত্রাস

পরিচয়

সন্ত্রাস হলো ফিতনা-ফাসাদের আধুনিক রূপ। সন্ত্রাস শব্দের অর্থ অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ। অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে বা জোর খাটিয়ে মানুষের কাছ থেকে কিছু আদায় করা বা আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টির নীতিকে সন্ত্রাস বলে।

সন্ত্রাসের কুফল

সন্ত্রাসের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। মানুষের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ব্যাহত হয়। সন্ত্রাসকবলিত জনপদে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। যখন তখন কেউ অপমৃত্যুর শিকার হতে পারে। সন্ত্রাসের কারণে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা থাকে না। সম্ভ্রমের নিরাপত্তা থাকে না। পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। বিদ্বেষ বেড়ে যায়। আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসন স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

ইসলাম সন্ত্রাস প্রতিরোধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থেকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। আর এ যুদ্ধকে মুমিনদের ইমান রক্ষার যুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহর বাণী,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

অর্থ : "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়।" (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৩৯)

সন্ত্রাস দমনে ইসলাম সাধারণত তিন প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে।

১. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত অপছন্দ করেন। মহান আল্লাহ সন্ত্রাসকে হত্যার চেয়ে জঘন্য আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

অর্থ: "আর ফিতনা (বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস) হত্যার চেয়ে জঘন্য।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯১)

যারা আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞার পরও বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় বা সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখবে, তাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে বিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩৩)

২. কারণ উদঘাটন ও নিরসন

ইসলাম সন্ত্রাসের কারণ উদঘাটন ও তা নিরসনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্য ইসলামে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি জোর দিয়েছে।

৩. নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ

জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামি বিধান কার্যকর করে ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে সন্ত্রাস দূর করা যায়।
নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সন্ত্রাসী কাজকে ঘৃণা করা এবং সন্ত্রাসীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার মাধ্যমে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সন্ত্রাসের কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৬

এইচআইভি এবং এইডস

বর্তমান শতাব্দীর এক মহাআতঙ্কের নাম এইডস। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগেও এইডস বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। এ রোগটি ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে ধরা পড়ে। যে ভাইরাস থেকে এ রোগটি হয় তার নাম Human Immune Deficiency Virus, এর সংক্ষিপ্ত নাম HIV– এটি একটি ঘাতক ব্যাধি। HIV দ্বারা কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে তাকে "এইচআইভি বহনকারী" হিসেবে চিহ্নিত Y করা হয়। এ ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে রক্তের রোগ প্রতিরোধকারী T4 কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এক পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এইচআইভি যেভাবে ছড়ায়

বয়স, জাতি, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবাই এইচআইভি দ্বারা সমানভাবে আক্রান্ত হতে পারে। এইচআইভি মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের তরল পদার্থের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। তরল পদার্থগুলো হলো রক্ত, বীর্য, মাতৃদুগ্ধ ইত্যাদি। যদি এইচআইভি আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার শরীরের তরল পদার্থ কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে, তবে তিনি এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন।

এইচআইভি এবং এইডস যেসব কারণে ছড়ায় তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো–

ক. অবৈধ মেলামেশা।

খ. মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সিরিঞ্জের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো।

গ. অপরিশোধিত রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো।

প্রতিরোধের উপায়সমূহ

১. সুস্থ বৈবাহিক জীবনযাপন করা।

২. নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা এড়িয়ে চলা।

৩. মাদক ও নেশা জাতীয় সকল জিনিস বর্জন করা।

৪. অপরিশোধিত রক্ত শরীরে প্রবেশ না করানো।

আমরা ইসলামি বিধিবিধান মেনে চলব। সামাজিক অপরাধসমূহ এড়িয়ে চলব। আমরা নিজেকে এবং সমাজকে সকল অপরাধ ও রোগসংক্রমণ থেকে রক্ষা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. সন্তানের বেহেশত —— পদতলে।

২. ধৈর্য মানবজীবনের একটি —— ।

৩. —— একটি বড় অভিশাপ।

৪. জাতির নেতা তিনিই, যিনি তাদের —— ।

৫. যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে সে —— প্রবেশ করবে না।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে	মানসিক ব্যাধি
২. অশ্লীল আচরণকারী	গুরুতর
৩. পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক	ভাই ভাই
৪. ফিত্না (বিশৃঙ্খলা) হত্যা অপেক্ষা	সকলের নিকট ঘৃণিত
৫. নিশ্চয়ই মুমিনগণ	পছন্দ করেন না

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সদাচরণ বলতে কী বোঝায়?

২. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়?

৩. অশ্লীলতা কী? সংক্ষেপে লিখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ইসলামের দৃষ্টিতে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।

২. ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

৩. সন্ত্রাস প্রতিকারের উপায় কী? বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভ্রাতৃত্বকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক দুই খ. তিন

গ. পাঁচ ঘ. সাত।

২. সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত হলো−

i. সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা

ii. পরস্পরের দ্বন্দ্ব মেটানো

iii. সন্তানকে শিক্ষা দান

কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

শাহরিয়ার সাহেব একজন বড় কর্মকর্তা। তিনি সহকর্মীদের ছোট ছোট ভুলের কারণে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন।

৩. শাহরিয়ার সাহেবের কাজটি কিসের প্রতীক?

ক. ঘৃণার	খ. অহংকারের
গ. অন্যায়ের	ঘ. অসভ্যতার।

৪. শাহরিয়ার সাহেবের কাজের ফলে−

i. জান্নাত হারাম হবে

ii. পরলৌকিক জীবন দুঃসহ হবে

iii. সকলের নিকট ঘৃণিত হবে

কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii ও iii
গ. iii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রায়হান সাহেব কক্সবাজারের একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক। তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে রায়হান সাহেবের বন্ধু আব্বাস সাহেবের স্ত্রী প্রভাষক পদে আবেদন করেন। পরে রায়হান সাহেবের অনুরোধক্রমে আব্বাস

সাহেবের স্ত্রী উক্ত পদে নিয়োগ লাভ করলে আব্বাস সাহেব সস্ত্রীক রায়হান সাহেবের বাসায় হাজির হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং একটি স্বর্ণের চিংড়ি মাছসদৃশ শো-পিস উপহার হিসেবে প্রদান করেন। একদা রায়হান সাহেবের ছোট মেয়ের বান্ধবী আবিদা বেড়াতে এসে না বলে উক্ত শো-পিসটি নিয়ে যায়।

ক. হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা দেখে কে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল?

খ. হিংসার একটি সামাজিক কুফল ব্যাখ্যা কর।

গ. রায়হান সাহেবের দ্বিতীয় কাজটি আখলাকে যামিমার কোন কাজের অন্তর্ভুক্ত? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আবিদার কাজটির পরিণাম বিশ্লেষণ কর।

২.

চিত্র নং ১: রাস্তা সংস্কার হলো গ্রামবাসীর শ্রমে। ১ জুলাই, ২০১২ প্রথম আলো।

চিত্র নং ২: রোগীর অনুভূতি- এখানে বড় ডাক্তার বসেন, রোগী দেখে কোনো টাকা নেন না। ওষুধও ফ্রি পাই। (সংক্ষেপিত)

ক. 'উত্তম চরিত্রই হলো সকল নেক কাজের মূল কথা'–বাণীটি কার?

খ. ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ বলতে কী বোঝায়।

গ. ১নং ছবিতে গ্রামের বাসিন্দাদের কাজটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ২নং ছবিটি যে বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

মহান আল্লাহ্ তাঁর শ্রেষ্ঠ্যত্ব প্রকাশের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহ্র ইবাদত করা, আল্লাহ্র বিধিনিষেধ মান্য করা। আর এসব বিধিনিষেধ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অবশ্যই একটি অনুসরণীয় নীতিমালা প্রয়োজন। যাকে আমরা আদর্শ বলতে পারি। মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত নবিগণের জীবনচরিত আমাদের আদর্শ। এর মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন চরিত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এমনিভাবে যাঁরা নবি ও রাসুলগণের জীবনী অনুকরণ করে ধন্য হয়েছেন তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলোকেও আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আদর্শ জীবন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারব এবং তাঁদের গুণাবলি বাস্তব জীবনে প্রতিফলনে আগ্রহী হব।
- হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট, মক্কা বিজয়, উদারতা, মহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, বিদায় হজের ভাষণ ও আদর্শ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব এবং মহানবি (স.) এর আদর্শ বাস্তব জীবনে প্রতিফলনে উৎসাহী হব।
- হযরত আয়িশা (রা.)-এর পরিচয়, শিক্ষাজীবন, ইফকের ঘটনা, শিক্ষায় অবদান, শিক্ষকতা, গুণাবলি ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারব এবং বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ হব।
- হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.) ও হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারব ও অনুসরণে আগ্রহী হব।
- বাস্তব জীবনে মনীষীগণের গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হব।
- দলগতকাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে পারব এবং সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানে আগ্রহী হতে পারব।

পাঠ ১

হযরত সুলায়মান (আ.)

পরিচয়

হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর প্রসিদ্ধ নবি ছিলেন। তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৯৭০-৯৭৫-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। যে চারজন বাদশাহ সমস্ত পৃথিবীর শাসক ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁদের একজন। তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পর তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আ.) ইন্তিকাল করেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে নবি হিসেবে হযরত দাউদ (আ.) -এর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব দান করেন।

অলৌকিক ক্ষমতা লাভ

নবি হিসেবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদা ছিল। আল্লাহ তাঁকে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু ও জিন-ইনসানের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

"সে (সুলায়মান) বলল : হে মানুষ! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু (জ্ঞান) দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। (সূরা আন-নামল, আয়াত ১৬)

তিনি ছিলেন সুবিশাল রাজ্যের রাজা। শাসনকার্য সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। খুব দ্রুত যাতায়াত করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে বাতাসে ভর করে চলাচল করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তাঁর যখন যে স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন হতো তিনি বাতাসকে আদেশ করলে বাতাস তাঁকে তাঁর বিশাল সিংহাসন ও লোকবলসহ মুহূর্তে সে স্থানে পৌঁছে দিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

অর্থ : "আমি বায়ুকে সুলায়মানের অধীন করেছিলাম। সে সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত ও সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (সূরা সাবা, আয়াত ১২)

আল্লাহ তায়ালা জিনদের মধ্য হতে একদলকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অধীন করে দিলেন। তারা হযরত সুলায়মানের জন্য সমুদ্র হতে মুক্তা সংগ্রহ করে আনত। এ ছাড়া অন্যান্য কাজও করত। যেমন, সু-উচ্চ প্রাসাদ, চৌবাচ্চার ন্যায় বড় পেয়ালা ইত্যাদি নির্মাণ করত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ۝

"এবং (আমি অনুগত করে দিলাম) শয়তানদের, যারা সকলেই ছিল প্রাসাদনির্মাণকারী ও ডুবুরি।" (সূরা সাদ, আয়াত ৩৭)

তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে গোয়েন্দার কাজ করতে আল্লাহ পাক তাঁকে 'হুদহুদ' নামক একটি পাখি দিয়েছিলেন। সে পাখিটি তাঁকে রাণী বিলকিস ও তার রাজত্বের সংবাদ দিয়েছে। এ সবই তাঁর অলৌকিক শক্তির নিদর্শন।

বিচার শক্তি

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তি ছিল খুবই প্রখর। আল্লাহ তায়ালা তাকে খুব সূক্ষ্মভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খুব বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।

একদা দুজন নারী একটি শিশুর মাতৃত্ব দাবি করল। এর মীমাংসা করার জন্য তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর নিকট এলো। সেখানে হযরত সুলায়মান (আ.)ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন শিশু হলো একটি অথচ দাবিদার দুজন। তাহলে শিশুটি কেটে দুভাগ করে দুজনকে দিয়ে দেওয়া হোক। একথা বলে হযরত সুলায়মান (আ.) একটি ছুরি হাতে নিলেন। শিশুটিকে মাটিতে শুইয়ে দু'ভাগ করার জন্য উদ্যত হলেন। তখনই একজন নারী কাঁদতে কাঁদতে বললেন। আল্লাহর দোহাই! শিশুটিকে কাটবেন না আমি আমার দাবি ত্যাগ করলাম। শিশুটিকে জীবিত রাখুন এবং তাকে অপরজনের নিকট দিয়ে দিন। হযরত সুলায়মান (আ.) বুঝলেন এ নারীই শিশুটির প্রকৃত মাতা। তখন তিনি তাকে শিশুটি দিয়ে দিলেন এবং অন্যজনকে মিথ্যা বলার দায়ে শাস্তি দিলেন।

বালক বয়সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আরও একটি ঘটনা হলো– একদা দুজন লোক হযরত দাউদ (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিচারপ্রার্থী হলো। তাদের একজন ছিল রাখাল অপরজন কৃষক। কৃষক তথা শস্যক্ষেতের মালিক ছাগল রাখালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, রাখালের ছাগল রাতে ছাড়া পেয়ে তার সমস্ত ফসল বিনষ্ট করে ফেলেছে। সত্যতা যাচাই করার পর হযরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগলের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেতের মালিককে অর্পণ করুক। মামলার বাদী-বিবাদী উভয়ে রায় শুনে দরবার হতে যাওয়ার পথে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে দেখা হলে তিনি সব শুনে বললেন-আমি রায় দিলে তা ভিন্ন হতো, উভয় পক্ষের উপকার হতো। হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর পিতার নিকট তা ব্যক্ত করার পর তাঁর পিতা বললেন এর চাইতে উত্তম রায় কী হতে পারে? হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন আপনি সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম দ্বারা উপকৃত হোক। আর শস্যক্ষেত ছাগলের মালিকের নিকট অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপাদন করবে। যখন শস্যক্ষেত ছাগলে বিনষ্ট করার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে তখন তা তার মালিককে বুঝিয়ে দেবে। হযরত দাউদ (আ.) এ রায় পছন্দ করলেন এবং তা কার্যকর করতে বললেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ

"এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৭৯)

বাইতুল মুকাদ্দাস পুনঃর্নির্মাণ

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পিতা হযরত দাউদ (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাস পুনঃর্নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করার আগে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের আগে তিনি দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্! আমার সন্তানের দ্বারা তা নির্মাণ করাও। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। জেরুজালেমের ক্ষমতা গ্রহণ করে হযরত সুলায়মান (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এ মসজিদ নির্মাণে ৩০ হাজার শ্রমিকের ৭ বছর সময় লেগেছিল বলে কথিত আছে। মূলত জিন জাতিরাই এ মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেছিল।

রাজত্বকাল ও ইন্তিকাল

হযরত সুলায়মান (আ.) ৪০ বছর নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন এবং সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব করেন। তার শাসনকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৯৬০-৯২০ সাল পর্যন্ত। তাঁর ইন্তিকালের ঘটনা বিস্ময়কর। বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা ছিল অবাধ্য একদল জিন। তারা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের আগে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজ শেষ হবে না আর তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ জানলে জিনরাও কাজ করবে না। ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই হযরত সুলায়মান (আ.) উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশে ব্যবস্থা নিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত মেহরাবে (বিশেষ কক্ষে) প্রবেশ করলেন। তিনি নিয়ম অনুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু লাঠির ওপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হতো তিনি ইবাদতরত আছেন। জিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। এমতাবস্থায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়। এর মাঝে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজও সমাপ্ত হয়। অন্য দিকে আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর লাঠি উঁই পোকায় খেয়ে ফেলে।

লাঠি পড়ে গেলে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন সবাই জানতে পারল যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বছর। আল্লাহর বাণী-

"যখন আমি তার (সুলায়মানের) মৃত্যু ঘটালাম তখন জিনদিগকে তার মৃত্যুর বিষয়ে জানাল কেবল মাটির পোকা, যা তার লাঠি খেয়েছিল। (সূরা আল-সাবা, আয়াত ১৪)

তাঁকে জেরুজালেমের কুব্বাতুস্‌সাখারে দাফন করা হয়। জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে মানবিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় যে উদাহরণ হযরত সুলায়মান (আ.) আমাদের শিখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একটি সূক্ষ্ম বিচার সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২

হযরত মুসা (আ.)

আগমন বার্তা

প্রাচীনকালে মিসরীয় বাদশাহদের 'ফিরআউন' বলা হতো। হযরত মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফিরআউনের নাম ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুসআব। তাঁকে 'দ্বিতীয় রামসিস' (Ramses II)ও বলা হয়। ফিরআউন স্বপ্নে দেখে যে, 'বাইতুল মুকাদ্দাস' থেকে এক ঝলক আগুন এসে মিসরকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং তার অনুসারী 'কিবতি' সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বনি ইসরাঈলদের কোনো ক্ষতি করছে না। ফিরআউন তার রাজ্যের সকল স্বপ্নবিশারদ থেকে একসাথে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চায়। তারা বলল, ইসরাঈল বংশে এমন এক পুত্রসন্তানের আগমন হবে যে আপনাকে ও আপনার রাজত্বকে ধবংস করে দেবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফিরআউন ভীষণ উত্তেজিত হলো এবং দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ফিরআউন সেনাবাহিনীকে আদেশ দিল যে, বনি ইসরাঈল গোত্রে কোনো পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে যেন হত্যা করা হয়। এভাবে অসংখ্য ইসরাঈলি পুত্রসন্তান ফিরআউনের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়।

জন্ম

এমন দুঃসময়ে মৃত্যু পরওয়ানা কাঁধে নিয়ে হযরত মুসা (আ.) জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মহিমায় ফিরআউনের সৈন্যবাহিনী এ সংবাদ জানতে পারল না। অপরদিকে হযরত মুসা (আ.)- এর জননী খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর ইশারায় হযরত মুসা (আ.)-কে তাঁর মাতা সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। আল্লাহর কী মহিমা! সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফিরআউনের রাজ প্রাসাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়ল। ফিরআউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া (আ.) সিন্দুকটি খুললেন। ফুটফুটে একটি সুন্দর শিশু দেখে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। নিঃসন্তান হযরত আসিয়া (আ.) শিশুটি লালন-পালন করতে লাগলেন। শিশু মুসা অন্য কারো দুধ পান না করায় তাঁর মাকেই ধাত্রী নিয়োগ করা হলো। মহান আল্লাহর কুদরতে মুসা (আ.) তার মায়ের তত্ত্বাবধানেই ফিরআউনের ঘরে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। আল্লাহ বলেন-

فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ط

“তখন আমি তোমাকে (মুসা-কে) তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে দুঃখ না পায়।” (সূরা ত্বহা, আয়াত ৪০)

শিশুকালে ফিরআউন একবার মুসা (আ.)-কে কোলে তুলে নেয়। তখন শিশু মুসা (আ.) ফিরআউনের দাড়ি ধরে তার মুখে চড় মারেন। এতে ফিরআউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করতে চাইল এবং বলল এই সেই শিশু যে আমার রাজত্ব ধ্বংস করবে। তখন হযরত আসিয়া (আ.) এক ভয়ংকর অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে শিশু মুসাকে ফিরআউনের রোষানল থেকে রক্ষা করেন। তখন অগ্নি মুখে নেওয়ায় তার মুখে জড়তা তৈরি হয়।

মাদইয়ানে হিজরত

একদা হযরত মুসা (আ.) দেখতে পেলেন একজন কিবতি জনৈক ইসরাঈলিকে অত্যাচার করছে। তিনি অত্যাচারিত লোকটিকে বাঁচানোর জন্য অত্যাচারী কিবতি লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন। এতে লোকটি মারা যায়। হযরত মুসা (আ.) হতবাক হয়ে যান এবং ফিরআউনের ভয়ে মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ানে হিজরত করেন। সেখানে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত মুসা (আ.) তাঁর সান্নিধ্যে দশ বছর অতিবাহিত করেন। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কর্মদক্ষতা, চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সফুরাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন।

নবুয়ত লাভ

মাদইয়ানে কিছুকাল অবস্থানের পর মুসা (আ.) তাঁর পরিবারসহ মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তুর পাহাড়ের পাদদেশে আসার পর সন্ধ্যা হয়ে যায়। রাত্রি যাপনের জন্য তিনি পাহাড়ের নিকটে ‘তুয়া’ নামক পবিত্র উপত্যকায় তাঁবু স্থাপন করেন এবং সেখানে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব, যা প্রত্যাদেশ হয় তা শুনতে থাকো।” (সূরা ত্বহা : ১৩) আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে কথাবার্তা বলতেন। আর এ কারণে তাঁকে ‘কালিমুল্লাহ’ বলা হতো।

দীনের দাওয়াত

নবুয়ত লাভের পর হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে দীন প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন। যেহেতু তাঁর মুখে জড়তা ছিল তাই তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ হযরত হারুন (আ.)-কে নবুয়ত দান করেন এবং তাকে মুসা (আ.)-এর সহযোগী করে দেন। হযরত মুসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-কে নিয়ে ফিরআউনের কাছে যান এবং দীনের দাওয়াত দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“ফিরআউনের নিকট যাও নিশ্চয়ই সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। অতঃপর বলো, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আর আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যাতে তুমি তাকে ভয় করো।” (সূরা আন্-নাযিয়াত, আয়াত ১৭-১৯)

হযরত মুসা (আ.) ফিরআউনকে তাঁর মু'জিজাগুলো দেখালেন এবং তাকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার কথা বললেন। ফিরআউন এতে কর্ণপাত করল না। উপরন্তু সে হযরত মুসা (আ.)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল।

সত্যের জয় মিথ্যার ক্ষয়

হযরত মুসা (আ.) ফিরআউনের ষড়যন্ত্র বুঝে ফেললেন। তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। ফিরআউন হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর দলবলের মিসর ত্যাগের খবর শুনে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁদের পিছে ছুটল। হযরত মুসা (আ.) তাঁর দলবল নিয়ে নীল নদের তীরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে ফিরআউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাঁদের খুব কাছাকাছি চলে এলো। তখন মুসা (আ.)-এর অনুসারীরা ভয় পেয়ে গেল। মুসা (আ.) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নিশ্চয় আমার রব আমাদেরকে পথ দেখাবেন। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা (আ.) তাঁর লাঠি দ্বারা নদীতে আঘাত করলেন। নদীর পানিতে রাস্তা তৈরি হলো। বনি ইসরাঈলের ১২টি দলের জন্য ১২টি পথ হয়ে গেল। হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা নিরাপদে নদী অতিক্রম করলেন। ফিরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের নদী পার হতে দেখে তাঁদের অনুসরণ করল। যখন তারা নদীর মাঝখানে পৌঁছল তখনি রাস্তা নদীর পানিতে মিশে গেল। ফলে ফিরআউন তার দলবলসহ ডুবে মরল। আল্লাহর নবিকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাই ধ্বংস হলো। আর এভাবে সত্যের জয় হলো।

তাওরাত লাভ

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)-কে তাওরাত কিতাব দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। তিনি আল্লাহর আদেশে তাওরাত কিতাব আনতে তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে ত্রিশ দিন থাকার ইচ্ছা করলেন কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় আর দশ দিন বেশি অবস্থান করলেন। তুর পাহাড়ে হযরত মুসা (আ.) রোযা, ইতিকাফ ও কঠোর সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তিনি তুর পাহাড়ে থাকাকালীন সময়ে তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এমতাবস্থায় তাঁর অনুসারীদের অনেকেই 'সামেরি' নামক এক ব্যক্তির ধোঁকায় পড়ে গো-বৎস পূজা শুরু করে। হযরত মুসা (আ.) তাওরাত কিতাব নিয়ে এসে তাদের এ অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হলেন। তখন তাওবা হিসেবে গো-বৎস পূজারিদের একে অপরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলো। যার ফলে সত্তর হাজার বনি ইসরাঈল নিহত হয়। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) আল্লাহর নিকট খুব কান্নাকাটি করেন। অবশেষে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন।

হযরত মুসা (আ.) ১২০ বছর বয়সে সিনাই উপত্যকায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে তুর পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়। আমরা হযরত মুসা (আ.) এর মতো নির্ভীক হয়ে সত্যের পথে মানুষকে ডাকব। সৎ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণের মধ্যেই জীবনের সাফল্য নিহিত।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত মুসা (আ.)-এর মুজিজার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩

হযরত ঈসা (আ.)

পরিচয়

মানুষের মুক্তির পয়গাম নিয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব নবি ও রাসুল আগমন করেছেন হযরত ঈসা (আ.) তাদের অন্যতম। ফিলিস্তিনের 'বাইত লাহম' (বেথেলহাম) নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম মারিয়াম বিনতে হান্না বিনতে ফাখুজ। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর হুকুমে পিতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল হতেই খ্রিষ্টাব্দ গণনা করা হয়। পবিত্র কুরআনে তাঁকে 'মাসিহ ইবনে মারিয়াম' কালিমাতুল্লাহ ও রুহুল্লাহ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর ওপর আসমানি কিতাব ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে।

মু'জিজা

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মু'জিজা (অলৌকিক ক্ষমতা) দান করেন। তিনি দোলনায় থাকাবস্থায় বাক শক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা মুজিজা হিসাবে তাঁকে মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করার শক্তি দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহর হুকুমে মাটির তৈরি পাখিতে ফুৎকার দিয়ে জ্যান্ত বানিয়ে ফেলতেন। আল্লাহ বলেন-

"আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখির আকৃতি তৈরি করব। অতঃপর তাতে ফুৎকার দেব। ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করব।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪৯)

হত্যার ষড়যন্ত্র

হযরত ঈসা (আ.) ইহুদিদেরকে তাদের অপকর্ম হতে বাধা দিলে তারা তাঁর ওপর খুব ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়। পাশাপাশি হত্যার ষড়যন্ত্রও করে। এ হীন উদ্দেশ্যে তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘর অবরোধ করে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য 'তাইতালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে পাঠায়। কিন্তু মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। আর 'তাইতালানুস' নামক ঐ ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতি দান করেন। সে হযরত ঈসা (আ.)-কে কোনো কিছু করতে না পেরে বাইরে চলে আসে। অপেক্ষমান লোকজন তাকে হযরত ঈসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করে। অতঃপর সবাই মিলে তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

"তারা তাকে (ঈসা-কে) হত্যাও করেনি ক্রুশবিদ্ধও করেনি বরং তারা এরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল, যারা তার সম্পর্কে মতবিরোধ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সুরা আন-নিসা, আয়াত ১৫৭-১৫৮)

পুনরায় দুনিয়ায় আগমন

শেষ যামানায় পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। এসে তিনি ৪৫ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। জিযিয়া প্রথা (অমুসলিম থেকে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর) তুলে দেবেন। ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। সমস্ত শূকর মেরে ফেলবেন। আল্লাহর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এ সময় পৃথিবীর লোকজনের আর্থিক অবস্থা এত উন্নত হবে যে, দান-সদকা নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হযরত ঈসা (আ.) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মত হয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। এরপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁকে রাসুল (স.)-এর রওজা মুবারকের পাশে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন তাঁরা দুজন একই স্থান হতে উঠবেন।

ভ্রান্ত বিশ্বাস

খ্রিষ্টানরা নিজেদেরকে হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মাত মনে করে। অধিকাংশ খ্রিষ্টান বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, মারিয়াম (আ.) আল্লাহর স্ত্রী এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহুদিরা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। তবে কিছুসংখ্যক খ্রিষ্টান যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ইমান এনেছিল ও তাঁকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে পবিত্র কুরআনে 'হাওয়ারি' (সাহায্যকারী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

"বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।" (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ১-৩)

হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। তাঁকে আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিকে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) সংসারত্যাগী ছিলেন। কোনো ঘরও বাঁধেন নি এবং বিয়েও করেন নি। সারা জীবন তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রচার করে অতিবাহিত করেছেন। কী অবাক ব্যাপার! তাঁর উম্মাতেরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে প্রকাশ্যে শিরকে লিপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর জন্য হযরত ঈসা (আ.)-কে শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়।

তাই হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলার কোনো কারণ নেই। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আল্লাহর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সকলের উচিত তাঁর ব্যাপারে সঠিক আকিদা পোষণ করা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তিনি স্বাভাবিকভাবেই ইন্তিকাল করবেন। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসুল হিসেবেই বিশ্বাস করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিজার একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

হযরত মুহাম্মদ (স.)

হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মদিনায় অবস্থানকালে মাতৃভূমি মক্কার প্রতি দরদ অনুভব করেন। তাই তিনি ষষ্ঠ হিজরি সনে ১৪০০ সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা অভিমুখে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হন। তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) ও মক্কার কাফিরদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐতিহাসিকগণ এটাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে এ সন্ধিকে "ফাতহুম মুবিন" (সুস্পষ্ট বিজয়) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

কারণ

হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সন্ধিতে দশ বছর পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার কথা উল্লেখ ছিল। হুদায়বিয়ার সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী আরবের বনু খুযা'আ গোত্র মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বনু বকর গোত্র হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা একরাতে মহানবি (স.)-এর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ বনু খুযা'আ গোত্রের ওপর আক্রমণ করে। এতে বনু খুযা'আ গোত্রের কয়েক ব্যক্তি নিহত হয়। আহত হয় আরও অনেকে। বনু খুযা'আ গোত্রের লোকজন ঘটনাটি মহানবি (স.)-কে জানায়। তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করে। মহানবি (স.) চুক্তি অনুযায়ী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। দূত মারফত কুরাইশদের কাছে তিনি এ ঘটনার কৈফিয়ত তলব করেন। তিনি তাদের জানালেন-

ক. তোমরা খুযা'আ গোত্রকে ক্ষতিপূরণ দাও;

খ. অথবা বনু বকর গোত্রের সাথে মিত্রতা চুক্তি বাতিল কর;

গ. অথবা হুদায়বিয়ায় সম্পাদিত চুক্তি বাতিল কর।

কুরাইশরা শেষটাই গ্রহণ করল। হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে গেল।

ফলে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য হুদায়বিয়া চুক্তির বাধ্যবাধকতা আর রইল না। পরে কুরাইশরা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারল। তখন আপস-মীমাংসার জন্য কুরাইশরা আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠাল। এ পর্বে আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। অপরদিকে মহানবি (স.) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

মক্কা বিজয়

হিজরি অষ্টম বছরের রমযান মাসে দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মহানবি (স.) মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মহানবি (স.) মক্কার অদূরে 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে তাঁবু গেড়ে অবস্থান নেন। অপ্রত্যাশিতভাবে

উপনীত এ বিশাল বাহিনী দেখে আবু সুফিয়ানসহ মক্কাবাসী হতবাক হয়ে যায়। তারা বাধা দেওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে। বিনা বাধায় মহানবি (স.) জন্মভূমি মক্কা জয় করেন। স্বীয় জীবন ও ইসলাম রক্ষা করার জন্য মহানবি (স.) একদিন মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ বিজয়ী বীর বেশে তিনি জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তিনি আজ মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি। সত্যের বিজয় হলো আর মিথ্যার পরাজয় হলো। সত্যের পথে থাকলে বিজয় একদিন আসবেই।

মহানবি (স.)-এর উদারতা

মক্কার যে সকল লোক একদিন মহানবি (স.) এর জীবন নাশ করতে চেয়েছিল আজ তারাই তাঁর সম্মুখে অপরাধী ও দয়া ভিখারি হিসেবে উপস্থিত। মহানবি (স.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা আজ আমার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করো।” তারা বললো- أَخٌ كَرِيْمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيْمٍ অর্থ- “আপনি আমাদের দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র, আপনার নিকট দয়াপূর্ণ ব্যবহারই আমরা চাই।”

তখন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন- لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ- اِذْهَبُوْا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ অর্থ- “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।”

দয়ালু নবি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। এমনকি একসময়ের ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রু আবু সুফিয়ানকেও ক্ষমা করে দিলেন। উহুদ যুদ্ধে এ আবু সুফিয়ানই কুরাইশ বাহিনীর (অমুসলিম বাহিনীর) নেতা ছিল। তার নেতৃত্বেই কাফির বাহিনীর হাতে ৭০ জন মুসলমান সৈনিক শাহাদাত বরণ করেছিলেন। মহানবি (স.)-এর একটি দাঁত মোবারক ঐ যুদ্ধে শহীদ হয়। এত কিছুর পরও মহানবি তাকে ক্ষমা করেছিলেন। শুধু ক্ষমাই শেষ নয়। মহানবি (স.) আরও ঘোষণা দিলেন “স্বীয় ঘর ও কাবা শরিফের পাশাপাশি যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তারাও ক্ষমা এবং নিরাপত্তা পাবে।” মহানবি (স.) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকেও ক্ষমা করলেন। হিন্দা মহানবি (স.)-এর প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রা.) শহীদ হওয়ার পর তাঁর নাক, কান কেটেছিল এবং বুক চিরে কলিজা বের করে চর্বণ করে চরম নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতার পরিচয় দিয়েছিল। তাকেসহ মক্কার সকলকে ক্ষমার এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা হতে হিজরত করে আসা মুহাজির ও মদিনায় বসবাসকারী আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করেছিলেন। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট রাখার জন্য মহানবি মসজিদে নববিকে মিলনকেন্দ্র বানিয়ে দিলেন। এ ভ্রাতৃত্ব শুধু মুখে মুখে ছিল না বরং মুহাজিরদেরকে আনসারদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিকের ঘরে যেদিন এ ভ্রাতৃত্ববন্ধন তৈরি করেছিলেন ঐ দিন ঐ গৃহে মোট ৯০ জন সাহাবি ছিলেন। তাঁদের অর্ধেক ছিল মুহাজির আর বাকি অর্ধেক ছিল আনসার। সম্পত্তিতে মুহাজিরদের উত্তরাধিকার বিধানটি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। জন্মসূত্রে আবদ্ধ না হয়ে এমন ভ্রাতৃত্ববন্ধন মানব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বিদায় হজের ভাষণ

সূরা আন-নাসর নাযিল হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (স.) বুঝতে পারলেন যে, তার জীবন প্রায় শেষ। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে (দশম হিজরি) ২৩ ফেব্রুয়ারি লক্ষাধিক সাহাবিকে সাথে নিয়ে হজ করতে মক্কা অভিমুখে

রওয়ানা দিলেন। একে বিদায় হজ বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) ৯ই যিলহজ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের সামনে যে ভাষণ দেন, তাকে বিদায় হজের ভাষণ বলা হয়। উক্ত ভাষণে তিনি ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রিয়জীবন পর্যন্ত সর্বপ্রকার দায়িত্ব, লেনদেন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। নিম্নে বিদায় হজে প্রদত্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো। আরাফাতের ময়দান সংলগ্ন 'জাবালে রহমত' এর উঁচু টিলায় উঠে মহানবি (স.) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেনঃ

১. হে মানব সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ, আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কি না জানি না।

২. আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনই তোমাদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট পবিত্র।

৩. মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন সকলকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে।

৪. হে বিশ্বাসীগণ, স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে।

৫. সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে ও সুদ খাবে না।

৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করো না।

৭. মনে রেখো! দেশ, বর্ণ-গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ হতে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হলো। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহ-ভীতি বা সৎকর্ম, সে ব্যক্তিই সবচেয়ে সেরা যে নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

৮. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, পূর্বের অনেক জাতি এ কারণে ধ্বংস হয়েছে। নিজ যোগ্যতা বলে ক্রীতদাস যদি নেতা হয় তার অবাধ্য হবে না। বরং তার আনুগত্য করবে।

৯. দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোন অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবু তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

১০. জাহিলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী এবং তাঁর রাসুলের আদর্শ রেখে যাচ্ছি। এতে যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।

১১. আমিই শেষ নবি আমার পর কোনো নবি আসবেন না।

১২. তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেবে।

তারপর হযরত মুহাম্মদ (স.) আকাশের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি? সাথে সাথে উপস্থিত জনসমুদ্র হতে আওয়াজ এলো "হ্যাঁ"। নিশ্চয়ই পেরেছেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। এর পরই আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ط অর্থ- "আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

মহানবি (স.) কিছুক্ষণ সময় নীরব থাকলেন। উপস্থিত জনতাও নীরব ছিল। অতঃপর সকলের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আল বিদা' (বিদায়)। একটা অজানা বিয়োগব্যথা উপস্থিত সকলের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। বিদায় হজ থেকে ফিরে মহানবি (স.) কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর ১১ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬৩২ খ্রিঃ ৭ই জুন সোমবার ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ (স.)

জীবনের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নিয়মনীতিকে আদর্শ বলা হয়। এ হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা বলেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ অর্থ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১)

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়েই হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের আদর্শ।

ক. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যক্তিগত আদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (স.) ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, হাস্যোজ্জ্বল ও দয়ালু ছিলেন। ধনী, দরিদ্র, ইয়াতিম, অসহায়, রাজা-প্রজা সকলের সাথে তার আচরণ ছিল অনুকরণীয়। তাঁর দয়া ও ভালোবাসা সকলের পাশাপাশি শিশুদের প্রতিও ফুটে ওঠে। তিনি শিশুদের প্রতি সদয় আচরণ করতেন। অন্যকেও তা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا অর্থ- "যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (সুনানে তিরমিজি)

ক্রীতদাস থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, আত্মীয়-অনাত্মীয় এমনকি জীবজন্তুর প্রতিও দয়া প্রদর্শন করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন- "জমিনে বসবাসকারীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানবাসীরাও তোমাদের প্রতি দয়া করবে।" (সুনানে তিরমিজি)

এক কথায়, ক্ষমাশীলতা, উদারতা, সততা ও সত্যবাদিতা, সংযম, ন্যায়পরায়ণতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম ও ওয়াদা পালনসহ অনুসরণীয় গুণাগুণ রাসুল (স.)-এর জীবনে বিদ্যমান ছিল।

খ. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পারিবারিক আদর্শ

পরিবার সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য একজন মানুষের জীবনে যতগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন সব গুণই মহানবি (স.)-এর জীবনে ছিল। তিনি স্ত্রী-কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলের জন্য আদর্শ ছিলেন। পরিবারের যেকোনো সদস্য তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। তাদের সাথে সদা সত্য কথা বলতেন। মিথ্যাকে তিনি আজীবন ঘৃণা করতেন। তাঁর ব্যবহারে নম্রতা প্রকাশ পেত। তিনি পরিবারের সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কোনো বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। পরিবারের কারো প্রতি রাগ করলে শুধু মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ভালো-মন্দ কিছু বলতেন না। তাঁর পরিবারে একাধিক স্ত্রী থাকার পরও তিনি সকলের সাথে সমান আচরণ করতেন। তাঁর আচরণের কারণে পরিবারের কোনো সদস্যের মাঝে কখনো ঝগড়া বিবাদ হয়নি।

গ. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সামাজিক আদর্শ

বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তাঁর সমস্ত জীবনই ছিল সংস্কারধর্মী। সমাজ ও জাতীয় জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা তিনি সুন্দর ও কল্যাণমুখী করে সংস্কার করেননি। সামাজিক অত্যাচার ও অন্ধকার অনাচারে নিমজ্জিত আরব সমাজে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

জাহেলি যুগে বিভিন্ন কারণে গোত্রদ্বন্দ্ব লেগে থাকত। সামান্য কারণেই গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যেত। তা ছাড়া আরব মরুচারী গ্রাম্য লোকেরা লুটতরাজ করত। হযরত মুহাম্মদ (স.) সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটালেন এবং লুটতরাজ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেন। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের অনেক গোত্রে ও সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। তারা কেবল ভোগের পাত্রী ছিল। উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হতে তারা বঞ্চিত ছিল। মহানবি (স.) নারীদের এসব দুর্গতি হতে রক্ষা করেন। তাদের ধর্মীয় সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেন। তিনি ঘোষণা করেন- اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ অর্থ-"মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" (কানযুল উম্মাল)

মহানবি (স.) কন্যাসন্তানকে জীবিত কবর দেওয়া বন্ধ করেন। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়াকে অভিশাপের পরিবর্তে সম্মানের বলে আখ্যা দেন। সুন্দরভাবে কন্যাসন্তান লালন-পালনকারীর জন্য বেহেশতের ঘোষণা দেন। ধনী-গরিব সকলের জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। গোলাম-দাসী সকলের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। তাঁর আচার-আচরণে হতাশাগ্রস্থ মানুষ দিকনির্দেশনা পেত।

এ ছাড়া তিনি সামাজিক সকল অনাচার ও বৈষম্য দূর করেন। ছোট-বড় সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সকল প্রকারের সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় যেমন-সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া ও বেহায়াপনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। এভাবে তিনি সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাজনৈতিক আদর্শ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) পরিপূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় আল কুরআনের সর্বজনীন গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেন।

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের অনেক সমাজ ও গোত্র 'জোর যার মূলুক তার' এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। মহানবি (স.) দেশ পরিচালনায় জনগণের মতামতের স্বীকৃতি দেন। যা গণতন্ত্রের মূল কথা। তিনি ধনী, গরিব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বর্ণ, গোত্র সকল বৈষম্যের অবসান ঘটান। রাষ্ট্রের সকলের সমঅধিকার ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অমুসলিম নাগরিকদেরও নিরাপত্তা দেন। তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের চোখে মুসলিম-অমুসলিম, ধর্ম, বর্ণ-গোত্র সকলে সমান এ নীতির বাস্তবায়ন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ভিত্তি মজবুত করার জন্য মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তি 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত।

ঙ. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শ

মহানবি (স.) তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের যে প্রচলন ছিল তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুদের পরিবর্তে ব্যবসাকে উৎসাহিত করেন। আল্লাহ্ বলেন- وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"আল্লাহ্ সুদকে হারাম (নিষিদ্ধ) আর ব্যবসাকে হালাল (বৈধ) করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫)

ঘুষ প্রথাও তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন: "ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষ দাতা উভয়ে জাহান্নামি"। সমাজ থেকে তিনি প্রতারণামূলক সকল ব্যবসা বন্ধ করে দেন। সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। সম্পদে যাতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত থাকে তার উদ্যোগ নেন। রাজস্বের উৎস হিসেবে যাকাত, গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী), জিযিয়া (অমুসলিম হতে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর), খারাজ (অমুসলিমদের ভূমিকর), উশর (মুসলিমদের উৎপন্ন ফসলের কর) ইত্যাদি গ্রহণ করেন।

পাঠ ৫

হযরত আয়িশা (রা.)

পরিচয়

হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রী। তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা। তাঁর মায়ের নাম উম্মে রুম্মান। তাঁর উপাধি ছিল 'সিদ্দিকা' ও 'হুমায়রা'। আর তাঁর উপনাম হলো-উম্মুল মুমিনিন ও উম্মু আব্দুল্লাহ। তিনি হিজরতের পূর্বে ৬১৩/৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ বংশের নিয়মানুযায়ী জন্মের পর তাঁর লালন-পালনের ভার দেওয়া হয় ওয়ায়েল নামে এক লোকের স্ত্রীর ওপর। শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারিণী। শিশুকাল থেকে তাঁর শিক্ষাগ্রহণ শুরু হয়। শৈশবকালেই তাঁর আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা ও মেধাশক্তি সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর মধ্যে সর্বদা শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তিনি অন্য শিশুদের মতো খেলাধুলা, আমোদফূর্তি ও দৌড়াদোড়ি করতে ভালোবাসতেন।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর নবুয়তের দশম সনে মহানবি (স.)-এর সাথে হযরত আয়িশা (রা.)-এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। হযরত খাওলা বিনতে হাকিম ছিলেন এ বিবাহের ঘটক। এ বিয়েতে দেনমোহর নির্ধারিত হয় ৪৮০ দিরহাম। বিবাহের তিন বছর পর রাসুল (স.)-এর সাথে হযরত আয়িশা (রা.)-এর দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। হযরত আবু বকর (রা.) বিবাহের কাজির দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষাজীবন

তৎকালীন আরব সমাজে লেখা-পড়ার তেমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। হযরত আয়িশা (রা.) পিতার কাছ থেকেই মূলত লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। যা একবার শুনতেন সাথে সাথে মুখস্থ করে ফেলতেন। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন ছাড়াও তিনি গৃহস্থালী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

ইফকের ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরি সনে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে রাসুল (স.)-এর সাথে হযরত আয়িশা (রা.)ও ছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। হারানো হার খুঁজতে গিয়ে তিনি কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যান। ফিরতে দেরি হয়ে যায়। এ সুযোগে মুনাফিকরা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করল। এতে তিনি চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন একেবারে বিষণ্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি ধৈর্য হারাননি। আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে অটল ছিলেন। এ সময়ে রাসুল (স.)ও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তিনি চিন্তিত হলেন। হযরত আয়িশা (রা.)-এর পিতামাতাও চরম উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। অবশেষে হযরত আয়িশা (রা.)-এর পবিত্রতা বর্ণনা করে সূরা নুরে ১১-২১ নম্বর আয়াত নাজিল হলো। মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো। রাসুল (স.) চিন্তামুক্ত হলেন। হযরত আয়িশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও চারিত্রিক মাধুর্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শিক্ষায় অবদান

হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারিণী। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বিশেষ করে তাফসির, হাদিস, ফিকহ্ ও আরবদের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শরিয়তের বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েল ও নীতিগত বিষয়ে তার পরামর্শ নেওয়া হতো। তুলনামূলক কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০টি। তন্মধ্যে ১৭৪টি হাদিস ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি ৫৪টি হাদিস এবং ইমাম মুসলিম ৬৯টি হাদিস এককভাবে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইবনে শিহাব জুহুরি বলেন, 'তিনি (আয়েশা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন।' (তাহজিবুত্ তাহজিব)

শিক্ষকতা

উম্মুল মোমিনিন হযরত আয়িশা (রা.) শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষভাবে নারীদের বিভিন্ন বিষয় তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হতো। তিনি হাদিস শিক্ষাদানে বেশি সময় ব্যয় করতেন। একসাথে তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ছিল ২০০-এর অধিক। অনেক বড় বড় সাহাবি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ঘটনা, প্রশ্নোত্তর এবং সামাজিক বাস্তবতার আলোকে শিক্ষা দিতেন। হযরত আবু মুসা আশআরি (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আমর ইবনে আছ (রা.) প্রমুখ সাহাবি তাঁর হাদিসের পাঠদানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।

গুণাবলি

হযরত আয়িশা (রা.)-এর চরিত্র ও আদর্শ অতুলনীয়। তিনি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির দ্বারা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে বহুগুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন, অনন্য সুন্দরী, তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি সম্পন্ন, সত্যের সাধক, আদর্শ স্বামী সেবিকা, জ্ঞানতাপস ও সদালাপী। এক কথায় বলতে গেলে মানবীয় চরিত্রের সকল গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

মুনাফিক ও হিংসুকগণ তাঁর ওপর যে অপবাদ দিয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ধৈর্যই তাঁকে স্থির-অবিচল রেখেছিল।

রাতের অধিকাংশ সময় তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। গরিব অসহায়দের দান সদকা করতে তিনি পছন্দ করতেন ও আনন্দ পেতেন। দানশীলতা, মিতব্যয়িতা, দয়া, পরপোকারিতা, ধর্মপরায়ণতাসহ সর্ব প্রকার গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। স্বামী প্রেমও তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসুল (স.)ও তাঁর সাথে খেলাধুলা ও দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি কঠোরভাবে পর্দা করতেন।

মর্যাদা

হযরত আয়িশা (রা.) রাসুল (স.)-এর অতি আদরের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি মহানবি (স.)-এর অন্য স্ত্রীদের থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাসুল (স.) বলেন- "নারী জাতির ওপর আয়িশা (রা.)-এর মর্যাদা তেমন, যেমন খাদ্যসামগ্রীর ওপর সারিদের মর্যাদা।" (বুখারি ও ইবনে মাজাহ)। সারিদ হলো আরবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য, যা রুটি, গোশত ও ঝোলের সমন্বয়ে তৈরি হয়। রাসুল (স.) আরও বলেন-"আয়িশা (রা.) হলেন-মহিলাদের সাহায্যকারিনী।" (কানযুল উম্মাল)

একবার নবি করিম (স.) আয়িশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন-"হে আয়িশা! ইনি জিব্রাইল, তোমাকে সালাম দিচ্ছে।" (বুখারি)। হযরত আয়িশা (রা.) নিজ বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। আজকের নারী সমাজও যদি হযরত আয়িশা (রা.)-এর মতো তপস্যা করেন তাহলে তাঁরাও মর্যাদাবান হবেন।

ইন্তিকাল

উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়িশা (রা.) ৫৮ হিজরির ১৭ রমযান ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুলাই ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর। রাসুল (স.)-এর ইন্তিকালের পর আরও ৪০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

হযরত আয়িশা (রা.)-এর ধৈর্য, জ্ঞানসাধনা, পাণ্ডিত্য, স্বামীভক্তি ও চারিত্রিক মাধুর্য আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত আয়িশা (রা.)-এর উত্তম চরিত্রের ওপর একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)

পরিচয়

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ ৬১ হিজরি সনে উমাইয়া বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল আজিজ। মাতা হলেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর পৌত্রী উম্মু আসিম লায়লা। তিনি একজন উমাইয়া খলিফা ছিলেন। তাঁকে 'দ্বিতীয় উমর' ও ইসলামের 'পঞ্চম খলিফা' বলা হয়।

শৈশব ও শিক্ষাজীবন

শিশুকাল হতেই তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু ও জ্ঞানতাপস। শিশু বয়সে তিনি পিতার সাথে মিসর গমন করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। এরপর তিনি কুরআন ও হাদিসের উচ্চতর জ্ঞান লাভের আশায় মদিনায় গমন করেন। তৎকালীন সময়ে মদিনার বিখ্যাত শিক্ষকদের নিকট হতে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির ও আরবি সাহিত্যের উপর উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি উমাইয়া শাসক খলিফা আব্দুল মালিকের কন্যা ফাতিমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

গভর্নর পদে নিয়োগলাভ

খলিফা ওয়ালিদ, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ-কে ৮৭ হিজরি সনে মদিনার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দান করেন। তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ সহকারে দায়িত্ব পালন করেন। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি মজলিশে শুরা গঠন করেন। এর সদস্য ছিলেন দশ জন মুত্তাকি (আল্লাহভীরু) লোক। তিনি শাসনকার্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মজলিশে শুরার মতামত গ্রহণ করতেন।

শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন বিচারক নিয়োগ করেন। গভর্ণর থাকাকালে তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ কারণে তৎকালীন প্রখ্যাত মনীষী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব তাঁকে 'মাহদি' (সুপথপ্রাপ্ত) উপাধি দিয়েছিলেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ

গভর্নর নির্বাচিত হয়ে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ জনসাধারণের কল্যাণার্থে কাজ শুরু করেন। তিনি 'মসজিদে নববি'র সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন করেন। তিনি অসংখ্য ঘরবাড়ি, পয়ঃপ্রণালী ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। পিপাসার্ত মানুষের জন্য তিনি অনেক কূপ খনন করেন। মসজিদে নববির বাগানে একটি ঝর্ণা ও চৌবাচ্চা নির্মাণ করেন। সমগ্র এলাকায় বিশেষ করে মক্কা, মদিনা ও তায়েফের মাঝে চলাচলের জন্য সংযোগ সড়ক তৈরি করেন।

শুধু জনকল্যাণমূলক কাজ নয় তিনি জ্ঞানেরও প্রসার ঘটিয়েছেন। তিনি জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। গভর্ণর থাকাকালেও তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন।

খলিফা পদ লাভ

হিজরি ৯৯ সন মোতাবেক ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক ইন্তিকাল করলে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হন।

খলিফা নিযুক্ত হয়ে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের গৃহীত সকল অন্যায় নীতি বাতিল করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে খলিফা নির্বাচনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি উপস্থিত লোকদের বলেন- 'হে মানবমণ্ডলী! আমার অনিচ্ছা ও সাধারণ মানুষের মতামত ছাড়া আমাকে খলিফা মনোনীত করা হয়েছে। আমি আপনাদের বাধ্য করছি না, আপনারা যাকে ইচ্ছা খলিফা নির্বাচন করুন।' তার এ ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা বলল 'আমরা আপনাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিলাম, আমরা আপনার খিলাফতের ওপর সন্তুষ্ট।' অতঃপর তিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর প্রাদেশিক গভর্নরদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিতে তিনি উল্লেখ করলেন- "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তার কিতাব মেনে চলো এবং রাসুলের সুন্নাত অনুসরণ কর।"

উমাইয়া বংশের লোকজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাবে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের যে সকল সম্পদ দখল করে রেখেছিল তিনি তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এবং যথাযথ মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এমনকি তাঁর স্বীয় স্ত্রীর সম্পত্তি, উপঢৌকনসামগ্রী, গহনাদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বাইতুল মালে জমা দেন। রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ বাস্তবায়ন করেন। বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.)-এর শাসননীতি অনুসরণ করেন। অনারব মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সর্বজনীন মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরপেক্ষ শাসননীতি প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রে সুখশান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাদের সাম্রাজ্যবাদী ও স্বার্থান্বেষী নীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। রাষ্ট্রে ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মপরায়ণতা, সাম্যের ধারণা ও সকল জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে তাঁকে 'উমাইয়া সাধু' (Umayyad Saint) বলা হয়।

হাদিস সংকলনে অবদান

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে আল হাদিস। রাসুল (স.)-এর হাদিসগুলো হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। হাদিসগুলো সংরক্ষণ ও সংকলণের জন্য তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের নির্দেশ দেন। তিনি তাদের কাছে লেখেন-'তোমরা রাসুল (স.)-এর হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলণ করো।' তারই প্রচেষ্টায় মুসলিম বিশ্বে হাদিস সংকলিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহসহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ফলে হাদিস হারিয়ে যাওয়া ও বিকৃতি হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ বিশ্বাস করতেন যে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। তিনি গভর্নরদের নিকট প্রেরিত পত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিতেন। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তিনি অনেক প্রশিক্ষক নিয়োগ করেন। শিক্ষকদের জন্য মাথাপিছু মাসিক ১০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে সিন্ধু, আফ্রিকা, স্পেনসহ বিভিন্ন দেশে ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে।

কৃতিত্ব

দ্বিতীয় উমর নামে খ্যাত হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাষ্ট্র পরিচালনায় কুরআন-হাদিস ও খোলাফায়ে রাশেদিনের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাই তাঁকে চার খলিফার পর ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয়।

তাঁর আমলে কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি মানুষের মাঝে পারস্পরিক বিরোধ দূর করে সাম্য ও সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার এতবেশি উন্নতি হয়েছিল যে, যাকাত গ্রহণ করার মতো লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি ছিলেন একাধারে ফকিহ (ইসলামি আইনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ), মুজতাহিদ (ইসলাম ধর্মজ্ঞানে সুপণ্ডিত) এবং কুরআন ও হাদিসের হাফিজ।

চরিত্র

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ ছিলেন আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী, বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির মানুষ। তাঁর অন্তরে এত আল্লাহভীতি ছিল যে, তিনি প্রায় আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। খলিফা হয়েও তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দৈনিক মাত্র দু-দিরহাম ভাতা গ্রহণ করতেন।

একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তিনি অন্য ধর্মালম্বীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তার আমলে খ্রিষ্টান, ইহুদি ও অগ্নি উপাসকগণকে তাদের গির্জা ও উপাসনালয় নিজ নিজ অধিকারে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তার আমলে সকল ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করত। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে উদার চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। তিনি 'আইলা' ও সাইপ্রাসের খ্রিষ্টানদের কর কমিয়ে দেন। নাজরানের খ্রিষ্টানদের তিনি বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন। জ্ঞানচর্চায় অমুসলিম মনীষীদেরও সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাদের দ্বারা কয়েকটি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

ইন্তিকাল

এ মহামনীষী ১০১ হিজরি মোতাবেক ৭১৯ খ্রিষ্টাব্দের রজব মাসে মাত্র ৪০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল প্রায় আড়াই বছর। আমরা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজের জীবনাদর্শ অনুসরণ করব। তাঁর ধর্মপরায়ণতা, জীবনসাধনা, ন্যায়পরায়ণতা এবং অসাম্প্রদায়িক আদর্শ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজের ধর্মপরায়ণতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বাড়ির কাজ হিসেবে সংক্ষেপে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

হযরত রাবেয়া বসরি (র.)

জন্ম ও পরিচয়

ইসলামের ইতিহাসে নারীদের মধ্যে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে হযরত রাবেয়া বসরি (র.) অন্যতম। এ মহান তাপসী রমনী ৯৯ হিজরি মোতাবেক ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁকে বসরি বলা হয়। তাঁর পিতা খুব দরিদ্র ছিলেন। যেদিন রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ঐ দিন রাতে তার পিতার ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর মতো তৈলও ছিল না। তাঁর পিতাও একজন মুত্তাকি (আল্লাহভীরু) ছিলেন। চার বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ ছিলেন। তাই তার নাম রাখা হলো রাবেয়া (চতুর্থ)। বাল্য বয়সেই তার পিতামাতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তাঁকে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়।

ক্রীতদাসী

হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর পিতামাতার ইন্তিকালের পর তার বড় বোনেরা জীবন ও জীবিকার অন্বেষণে অন্যত্র চলে যান। এ সময়ে বসরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রীত হন। তাঁর মনিব ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। তাই তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করাত। রাবেয়া বসরি দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করতেন। তারপরও রাতের বেলায় বিনিদ্র থেকে শুধু আল্লাহর ইবাদত করতেন।

একদিন রাতে তাঁর মনিবের ঘুম ভেঙে গেল। সে জানালা দিয়ে দেখতে পেল, তার ক্রীতদাসী রাবেয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করছে। ওপর হতে একটি বাতি তার ঘর আলোকিত করে রেখেছে। এক পর্যায়ে রাবেয়া মোনাজাত ধরে আল্লাহর দরবারে বললেন, 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে কোনো মানুষের অধীন করে না রাখলে আমি সর্বক্ষণ শুধু তোমার ইবাদত করতাম।' রাবেয়ার মনিব এ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং সকালবেলা তাঁকে পরিপূর্ণ স্বাধীন করে দিল। তিনি জীবনে বিবাহ করেননি। কেবল আল্লাহর ইবাদতে জীবন কাটিয়ে দেন।

আল্লাহর ওপর আস্থা ও ইবাদত

তাপসী রাবেয়া বসরি (র.) আল্লাহর ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি জীর্ণ কুটিরে বসবাস করতেন। তবু কোনো মানুষের সাহায্য গ্রহণ করতেন না। হযরত রাবেয়া বসরি অসুস্থ হলে আব্দুল ওয়াহিদ আমর ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরি তাঁকে দেখতে যান। তখন সুফিয়ান সাওরি হযরত রাবেয়া বসরিকে বললেন, যদি আপনি মুখ খুলে বলেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দেবেন। রাবেয়া বললেন, হে আবু সুফিয়ান আপনি কি জানেন না কার ইচ্ছায় আমার এ অসুস্থতা? যাঁর ইচ্ছা তিনি কি আল্লাহ নন? সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ! রাবেয়া বললেন, তাহলে কেন আমাকে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে বলছেন!

মালিক ইবনে দিনার নামে এক লোক রাবেয়া বসরির পরিচিত ছিলেন। তিনি একদা রাবেয়ার আর্থিক দুরবস্থা দেখে বললেন, আপনি বললে আমি আমার এক ধনীবন্ধু থেকে আপনার জন্য সাহায্য আনতে পারি। রাবেয়া বললেন, হে মালিক! আমাকে এবং আপনার বন্ধুকে কি আল্লাহই রিযিক দেন না? মালিক বলল, হ্যাঁ! রাবেয়া বললেন, আল্লাহ কি দরিদ্রকে তার দারিদ্র্যের কারণে ভুলে যাবেন? এবং ধনীদেরকে তাদের ধনসম্পদের কারণে মনে রাখবেন? মালিক বলল, না। তখন রাবেয়া বললেন, আল্লাহ যেহেতু আমার অবস্থা জানেন তখন তাঁকে আমার আবার স্মরণ করানোর দরকার কী?

আল জাহিজ বলেন, রাবেয়ার কয়েকজন পরিচিত লোক তাঁকে বললেন, আমরা যদি আপনার আত্মীয় স্বজনদের বলি তাহলে তারা আপনাকে একজন ক্রীতদাস কিনে দেবেন। রাবেয়া বললেন, সত্য কথা এই যে, যিনি সমস্ত পৃথিবীর মালিক তার কাছেই পার্থিব কিছু চাইতে আমার লজ্জা হয়। অতএব যারা পৃথিবীর মালিক নয় তাদের কাছে কী করে আমি চাইতে পারি?

ইবাদত করার ক্ষেত্রে হযরত রাবেয়া বসরি (র.) ছিলেন অতুলনীয়। তিনি যখনই সময় পেতেন তখনই আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। অধিকাংশ সময় তিনি দিনে রোজা রাখতেন আর রাতে নফল নামায পড়তেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন যে, 'হে প্রভু, আমাকে আমার নিজ কাজে (ইবাদতে) ব্যস্ত রাখুন। যাতে আমাকে কেউ আপনার যিকির (স্মরণ) হতে বিমুখ করতে না পারে।'

আধ্যাত্মিকতা

শুধু পুরুষরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে এমন নয়। অনেক নারীও আল্লাহর 'ওলি' (বন্ধু বা কাছের লোক) হতে পেরেছেন। আল্লাহ তাদের অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়েছেন। হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এরও অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল।

একদা হযরত রাবেয়া বসরি (র.) একটি হাঁড়িতে কিছু খাদ্যদ্রব্য রান্না করছিলেন। তার একটি পেঁয়াজের দরকার পড়ে। কিন্তু তাঁর ঘরে কোনো পেঁয়াজ ছিল না। তখন একটি পাখি তার ঠোঁটে করে একটি পেঁয়াজ এনে তাঁর কাছে ফেলে দেয়।

হযরত রাবেয়া বসরি (র.) একবার শস্য বুনছিলেন। পঙ্গপালেরা শস্যক্ষেতের ওপর এসে পড়েছিল। তখন রাবেয়া প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার প্রভু এ হলো আমার জীবিকা। যদি আপনি চান তাহলে আমি তা আপনার শত্রুদের বা বন্ধুদের দিয়ে দেব।' তখন পঙ্গপালেরা উড়ে পালিয়ে গেল। ওলি হিসেবে তাঁর থেকে আরও অনেক কারামত প্রকাশিত রয়েছে।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত রাবেয়া বসরি (র.) সদা সর্বদা সহজ সরল জীবন-যাপন করতেন। তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন না। তিনি সর্বদা নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে করতেন। আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা চাইতেন, সর্বদা আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট তাওবা (অনুশোচনা) করতেন। তিনি বলতেন, 'মুখে মিথ্যা তাওবা করে কী লাভ যদি কাজে তা প্রমাণ পাওয়া না যায়।' তিনি সর্বদা আল্লাহর একজন শোকরগুজার (কৃতজ্ঞতাকারিণী) বান্দা ছিলেন। খেয়ে-না খেয়ে, দুঃখে-কষ্টে, সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

ইন্তিকাল

অনেক শ্রম, কষ্টসাধ্য ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জীবনযাপন করার পর আল্লাহর প্রিয় এই নারী ১৮৫ হিজরি/ ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বসরায় দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, মুহাম্মদ ইবনে তুসী নামক এক লোক তাঁর কবরে যান। গিয়ে বলেন যে, হে রাবেয়া, আপনি গর্ব করতেন যে, উভয় জগতের বিনিময়েও আপনি আপনার মাথা নত করবেন না। আপনি কি সেই উন্নত অবস্থা লাভ করেছেন? জবাবে একটি আওয়াজ এলো– 'আমি যা চেয়েছিলাম তা আমি পেয়েছি।'

হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবন আধ্যাত্মিকতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সংযমের আদর্শে পরিপূর্ণ। আমরা তাঁর জীবনের আলোকে আমাদের জীবন গড়ব। ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বসে হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. প্রাচীনকালে মিসরীয় বাদশাহদের —— বলা হতো।

২. হযরত সুলায়মান (আ.) —— বছর নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন।

৩. হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর ——।

৪. —— নাজিল হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (স.) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবন প্রায় শেষ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. অনেক নারী ও	সহজ সরল জীবন-যাপন করতেন
২. হযরত রাবেয়া বসরি (র.) সদা সর্বদা	আল্লাহর 'ওলি' হতে পেরেছেন
৩. আল্লাহ সুদকে হারাম আর	শরিক করো না
৪. আল্লাহর সাথে কাউকে	বাড়াবাড়ি করো না
৫. ধর্ম নিয়ে	ব্যবসাকে হালাল করেছেন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২. হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস কী ছিল?

৩. সংক্ষেপে হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আদর্শ মানব হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

২. হাদিস শিক্ষায় হযরত আয়িশা (রা.)-এর অবদান বর্ণনা কর।

৩. হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত হিজরিতে মক্কা বিজয় হয়?

ক. তৃতীয়   খ. পঞ্চম

গ. সপ্তম   ঘ. অষ্টম।

২. হযরত মুসা (আ.) কত বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন?

ক. ১১০ খ. ১২০

গ. ১৩০ ঘ. ১৪০।

৩. 'ফাতহুম মুবিন' বলতে বোঝায় –

i. সুনির্দিষ্ট বিজয়

ii. সুস্পষ্ট বিজয়

iii. হুদায়বিয়ার সন্ধি

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তায়েব নাবিলকে বলল, বিদায় হজের ভাষণের অনুসরণ করলে মানব জাতির মুক্তি নিশ্চিত হবে।

৪. তায়েবের বক্তব্যের মাধ্যমে কোন নবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে?

ক. হযরত ঈসা (আ.) খ. হযরত মুসা (আ.)

গ. হযরত মুহাম্মদ (স.) ঘ. হযরত দাউদ (আ.)।

৫. তায়েবের বক্তব্য অনুকরণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে–

i. শান্তি

ii. নেতৃত্ব

iii. ভ্রাতৃত্ব

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মুরাদ সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি এলাকায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তাঁর ছেলে মুবীন শীতকালীন ছুটিতে বাড়িতে এসে বাবার কার্যক্রমে খুশি হয়। একদিন সকালে ড্রয়িংরুমে বসে সে পত্রিকা পড়ছিল। হঠাৎ একই গ্রামের ছেলে তারিক এসে অভিযোগ করল যে, নয়নের গাভী তার ধানের ফসল নষ্ট করেছে। তখন তার বাবার অনুপস্থিতিতে উভয়ের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দিল যে, শস্যক্ষেত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত তারিক নয়নের গাভীর দুধ ভোগ করবে। উভয় পক্ষ এ সিদ্ধান্তে খুশি হলো। তার পিতাও তাকে ধন্যবাদ জানাল।

ক. হযরত সুলায়মান (আ.) এর পিতার নাম কী?

খ. মু'জিজা বলতে কী বুঝায়?

গ. মুরাদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন মনীষীর আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মুবীনের বিচক্ষণতা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে বর্ণনা কর।

২. সুরাইয়ার পিত্রালয়ে কাজ করতে এসে সালেহার সাথে সুরাইয়ার পরিচয় হয়। সালেহা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। বাবার মৃত্যুর পর কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ আদায় করত। সারারাত নফল ইবাদতে কাটাতে গিয়ে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়লেও ইবাদতে কোনোরূপ বিরক্ত হতো না। সে কখনো পরমুখাপেক্ষী হতো না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। সে জীবনে বিয়েও করেনি। পক্ষান্তরে সুরাইয়া ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকত। বিশেষ করে কুরআন ও হাদিস চর্চাই ছিল তার মূল কাজ। স্বামীগৃহে গিয়ে সংসার ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার যথাযথ পালনসহ রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে মগ্ন থাকত। সে ছিল সংস্কৃতিমনা, তবে পর্দার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার আপস করত না।

ক. মহানবি (স.) কোথায় বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন?

খ. 'সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়'– বুঝিয়ে লিখ।

গ. সুরাইয়ার কর্মে কোন মনীষীর আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সালেহার জীবনে হযরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে– উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

– সমাপ্ত –

২০১৬

শিক্ষাবর্ষ

৮-ইসলাম

তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর
এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়
আল-কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :